পরিবেশ ও বিজ্ঞান
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)
২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

(নমুনা পাঠ্যপুস্তক)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

-ঃ প্রকাশক ঃ-

অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের ২০১১-১২ সালের অনুমোদন অনুযায়ী এবং আর্থিক সহায়তায় রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ) কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির ষষ্ঠ শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ের খসড়া পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত।

-ঃ প্রকাশনার সময় ঃ-

মার্চ, ২০১২

-ঃ মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ঃ-

হুগলী প্রিন্টিং কোম্পানী লিমিটেড

৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

-ঃ সম্পাদক ঃ-

শ্রী দিব্যেন মুখার্জী

আই. এ. এস.

অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

-ঃ সহ-সম্পাদক ঃ-

শ্রী হীরক কুমার বারিক

রিসার্চ ফেলো (গ্রেড-II)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী

জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, (সর্বশিক্ষা অভিযান)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

-ঃ রচয়িতা মন্ডলী ঃ-

- **শ্রী রূপক হোম রায়,** প্রধান শিক্ষক, বালিগঞ্জ গভঃ হাই স্কুল
- **শ্রীমতী সুলগ্না চক্রবর্তী,** প্রধান শিক্ষিকা, দমদম মতিঝিল গার্লস হাই স্কুল
- **শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য,** প্রধান শিক্ষিকা, আনন্দ আশ্রম বালিকা বিদ্যাপীঠ
- **শ্রী রুদ্রনীল ঘোষ,** সহশিক্ষক, ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমী
- **শ্রী শোভন চক্রবর্ত্তী,** সহশিক্ষক, বালিগঞ্জ গভঃ হাই স্কুল
- **শ্রী রূপক সামন্ত,** সহশিক্ষক, রিষড়া বাণী ভারতী হাই স্কুল
- **ডঃ মৃণাল মুখার্জী,** সহশিক্ষক, নঙ্গী হাই স্কুল
- **শ্রী দিব্যেন্দু বিকাশ ঘোষ,** সহশিক্ষক
  নিউআলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল (গভঃ স্পনসর্ড)
- **শ্রী কৃষ্ণেন্দু কয়াল,** সহশিক্ষক, টাকী গভঃ হাই স্কুল

-ঃ চিত্র অংকন ঃ-

শ্রীমতী শিল্পী কুন্ডু

প্রস্তাবনা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)-এর পক্ষ থেকে ২০১১-১২ সালের পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের কাছে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে উচ্চ প্রাথমিক স্তরের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও ভৌত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন' এমন একটি প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া হয় ও সেটি অনুমোদিত হয়।

উক্ত প্রকল্পের প্রথম আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর দ্বারা গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির নমুনা পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ের নমুনা পাঠ্যপুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি আলোচনা সভায় খসড়া পুস্তক রচনার কাজ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে (পঃ বঃ) অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ের নমুনা পাঠ্যপুস্তকটি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫; শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ এবং পঃ বঃ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির নির্দেশ ও দিশা অনুযায়ী রচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তক রচনায় যে সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)-এর আধিকারিকগণ যুক্ত আছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ রথীন্দ্রনাথ দে কে যিনি এই নমুনা পুস্তকটি প্রস্তুতিতে প্রাথমিক দিক নির্দেশ দিয়েছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে রচিত রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)-এর এই নমুনা পাঠ্যপুস্তকটি যদি ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে তবে আমরা আনন্দিত হব।

দিব্যেন মুখার্জী
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

সূচীপত্র

আমাদের খাবার

আমরা প্রতিদিন কিছু খাবার খাই। ভেবে দেখো আজ তোমরা কী খেয়ে বিদ্যালয়ে এসেছো। বন্ধুদের থেকেও জানবে তারা কী খেয়ে এলো। চিন্তা করে দেখো তো সারাদিনে তোমরা কি একই ধরনের খাবার খাও?

খাদ্যের বৈচিত্র্য

তুমি কী খেয়েছো? বন্ধুদের থেকেও জেনে নাও তারা কী কী খাবার খেয়েছে। এইবার নীচের তালিকাটি পূরণ করতে চেষ্টা করো।

শিক্ষার্থীর নাম	খাবার সময়	খাবারের নাম
১।	সকাল	
	দুপুর	
	বিকাল	
	রাত্রি	
	অন্যান্য সময়	

এই তালিকা প্রস্তুত করা থেকে বোঝা যাচ্ছে খাবার নানা ধরনের হয়। সময় বা পছন্দ অনুযায়ী আমরা খাবার ঠিক করি। খাবারগুলি দেখতেও আলাদা আলাদা, তাদের স্বাদ-গন্ধ-বর্ণও আলাদা রকমের।

ভেবে দেখেছো কি খাবারগুলি কোথা থেকে আসে? কী দিয়ে তৈরী? সবটা নিজের নাও জানা থাকতে পারে। বন্ধু-বান্ধব, প্রয়োজনে পরিচিত বয়স্কদের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করতে পার। এইবার নীচের তালিকাটি পূরণ করার চেষ্টা করো।

খাবারের নাম	কি থেকে তৈরী	কোথা থেকে পাই	উদ্ভিদ/প্রাণী
১. ভাত	১. চাল	১. ধান	১. উদ্ভিদ
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

তোমাদের তৈরী করা তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে সব খাবারই উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গাছেদের বিভিন্ন অংশ থেকে এই খাবারগুলি আমরা পাই। উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাবারগুলি ভাল করে চেনার জন্য নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

খাবারের নাম	কোথা থেকে পাই	মাটির উপর/নীচ থেকে পাই	উদ্ভিদের কোন অংশ
১. ভাত	ধান গাছ	উপর থেকে	বীজ
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

উপরের তালিকায় খাদ্যের উৎস হিসাবে উদ্ভিদের নানা অংশের নাম উল্লেখ করেছো। পূর্বের তালিকা থেকে নীচের তালিকাটি সাজাবার চেষ্টা করো।

খাবারের নাম	মূল	কান্ড	পাতা	ফুল	ফল	বীজ
১. ভাত	—	—	—	—	—	ধান
২.						
৩.						
৪.						
৫.						

আমাদের অন্যতম খাদ্য ভাত। ভাত চাল থেকে হয়। চাল আমরা পাই ধান থেকে। ধান হল ফল। ভেতরের চাল হ'ল বীজ। তেমনি আমাদের অন্যতম খাবার হ'ল রুটি বা পরটা যা আটা থেকে হয়। গম থেকে আটা পাওয়া যায়। গমের দানার ওপরের অতি পাতলা স্তরটি হ'ল ফল এবং তার ভিতরের অংশটি হ'ল বীজ। এই বীজ গুড়ো হ'লেই আমরা আটা পাই।

গম

গমের মঞ্জরি

গম গাছ
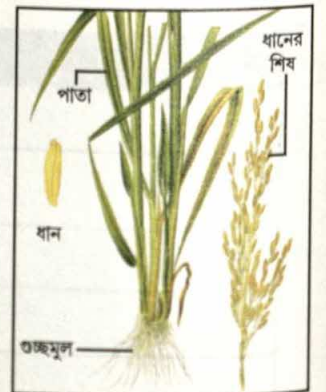
ধান গাছ

খাবার হিসাবে মুগ, মুসুর মটর ডাল আমাদের পরিচিত। মটর ডাল হ'ল আসলে শুকনো মটর দানা। একটি মটর শুটি নিয়ে প্রথমে লম্বালম্বিভাবে সবুজ খোসাটিকে খুলে ফেলো। ভেতরের গোল সবুজ অংশ, যাকে সাধারণ ভাষায় মটর দানা বলে, সেগুলি সংগ্রহ করো। একটি (বা একাধিক) মটর দানা মাঝখানে সাবধানে চাপ দিলে সেটি দুটো খন্ড হয়ে যাবে। নীচের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে চিহ্নিত অংশগুলি খুঁজতে চেষ্টা করো।

মটর বীজ ও তার বিভিন্ন অংশ
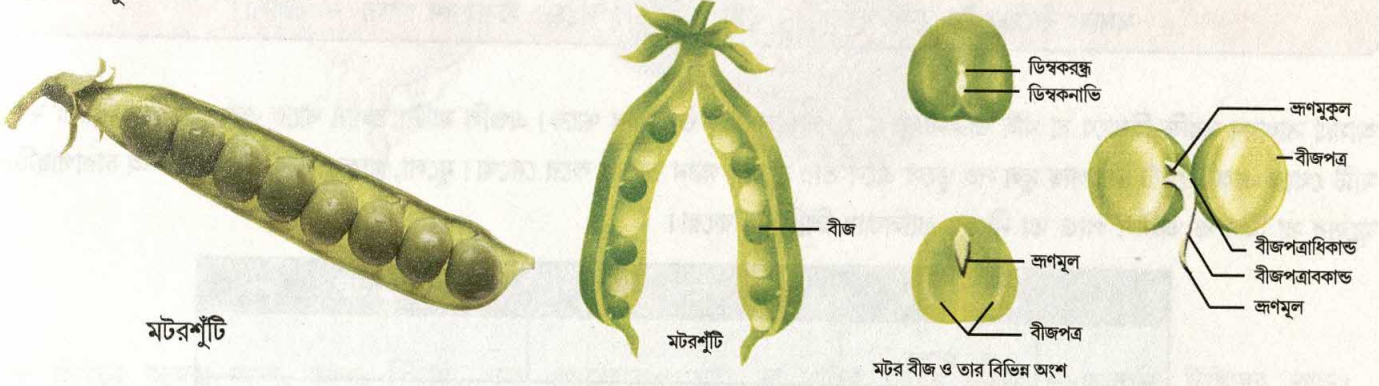
ফুল উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সাহায্য করে। পরাগ মিলনের মাধ্যমে ফুলের ডিম্বাশয়ের ভেতরে থাকা ডিম্বকের সাথে পরাগরেণু মিলিত হয় — এই ঘটনাটি হল নিষেক।

যে ডিম্বকের নিষেক ঘটল তা থেকে তৈরী হয় বীজ। বীজ নতুন চারা উদ্ভিদের ভ্রূণ ধারণ করে। ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে যাতে চারাগাছ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য খাদ্যের যোগান দেয় বীজ।

বীজ, বীজত্বক ও অন্তর্বীজ নিয়ে গঠিত। বীজের অংশগুলি নিচের ছকের মত করে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।
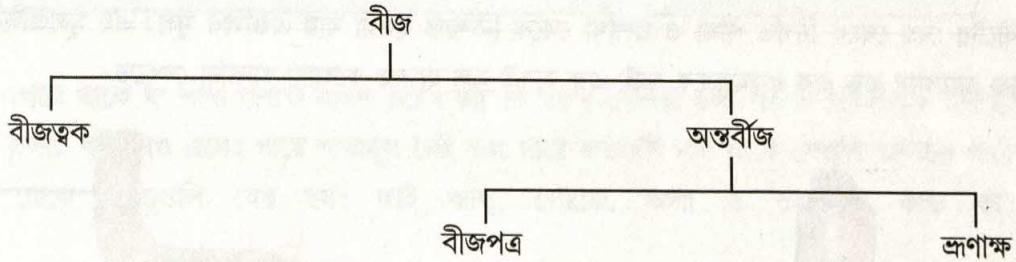
বীজের বাইরের ত্বক হল বীজত্বক। বীজত্বকের বাইরের স্তরটি হল — বীজবহিস্ত্বক এবং ভেতরের স্তরটি হল — বীজঅন্তস্ত্বক। বীজত্বকের ভেতরে বীজপত্র থাকে। কিছু বীজে এই বীজপত্রের সংখ্যা এক, সেই উদ্ভিদগুলিকে বলে একবীজপত্রী উদ্ভিদ। অনুরূপে বীজের বীজপত্রের সংখ্যা দুই হলে সেই উদ্ভিদকে বলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন মটর বীজ। বীজপত্রের সংখ্যা দুই -এর বেশী হলে সেই উদ্ভিদকে বলে বহুবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন পাইনগাছের বীজ। বীজপত্র ছাড়াও বীজের যে অংশ থেকে ভবিষ্যত চারাগাছের কান্ড ও মূল গঠিত হয়, তা হল ভ্রূণাক্ষ। ভ্রূণের যে অংশ থেকে শিশু উদ্ভিদের মূল গঠিত হয়, তা হল ভ্রূণমূল এবং যে অংশ থেকে কান্ড গঠিত হয়, তা হল ভ্রূণমুকুল।

বীজের বীজপত্রের বাইরে যে অংশে শিশুউদ্ভিদের জন্য ভবিষ্যতের খাদ্য সঞ্চিত থাকে, — তা হল সস্য। সস্য যুক্ত বীজকে বলে সস্যল বীজ। সব উদ্ভিদের বীজে সস্য থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে শিশু উদ্ভিদের ভবিষ্যতের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, — এরা হল অসস্যল বীজ।
সস্যল বীজের উদাহরণ হলো — ভুট্টা। অসস্যল বীজের উদাহরণ হলো — ছোলা।

আমরা সাধারণ সবজি হিসাবে যা খাই তার মধ্যে মূলো, রাঙালু, বীট ও গাজর থাকে। এগুলি মাটির তলায় থাকে এবং এগুলি উদ্ভিদের মূল। মাটি থেকে একটি ছোট চারাগাছ মূল সহ তুলে এনে তার মূলের গঠন ভালো করে দেখো। মূলো, গাজর ও বীটের সঙ্গে ওই চারাগাছটির মূলের যা মিল ও অমিল পাও তা নীচের তালিকায় লিপিবদ্ধ করো।

	সবজি	মিল	অমিল
চারা গাছের মূল	১. মূলো		
	২. গাজর		
	৩. বীট		
	৪. রাঙালু		

আদর্শ মূল মাটির তলায় থাকে — যা শাখা প্রশাখা যুক্ত। মূলের ও শাখাগুলির একেবারে নীচের দিকে সরু সুতোর মত কিছু অংশ থাকে যা জল ও লবণ শোষণ করে, সেগুলো হ'ল মূলরোম। মূল ও শাখামূলগুলির একেবারে সামনে একটি টুপির মত অংশ থাকে যা হ'ল উদ্ভিদের মূলত্র। এটি মূলকে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

মূলো, গাজর ও বীটের দেহ থেকে নির্গত শাখা ও প্রশাখা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় এগুলিও মূল। এই মূলগুলিতে উদ্ভিদের খাদ্য জমা থাকে এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে, তাই এরা সবাই মূল হলেও আলাদা আলাদা দেখতে।

আদর্শ মূলের ছবি

রাঙালু

বীট
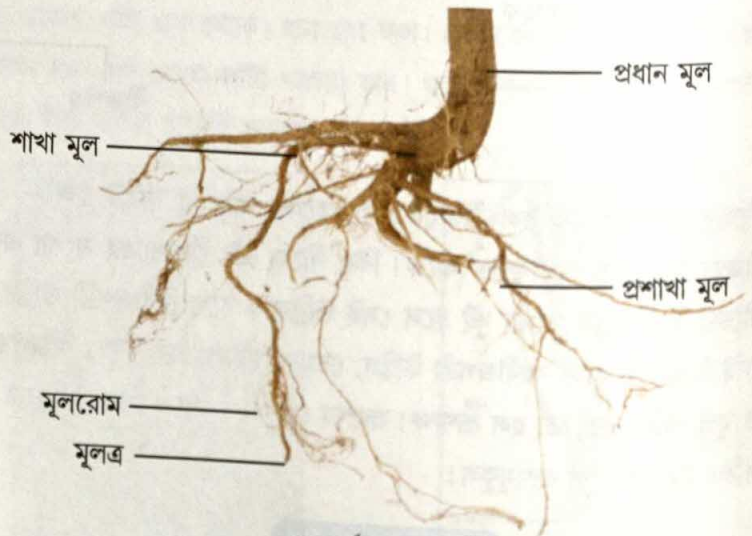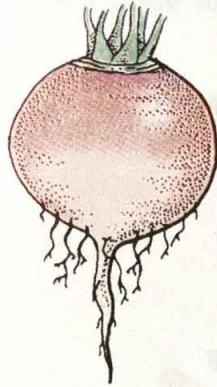
সবজি হিসাবে আমরা আলু, আদা, পিঁয়াজ, ওল এগুলোকেও খাই, যা মাটির তলায় থাকে, — এগুলি উদ্ভিদের কান্ড। লাউ, কুমড়ো, পুঁইশাক, আখ ইত্যাদি যা আমরা খাই তা হ'ল উদ্ভিদের কান্ডের অংশ।

আলু, আদা, পেঁয়াজ ও ওলের সঙ্গে আদর্শ কান্ডের কিছু মিল বা অমিল আছে কিনা লক্ষ্য করে নীচের তালিকায় লিপিবদ্ধ করো ঃ-

	মাটির তলার কান্ড	মাটির ওপরের কান্ড
মিল		
অমিল		

আদর্শ কান্ড মাটির ওপরে থাকে যা শাখা প্রশাখা ধারণ করে। কান্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পর্ব ও পর্বমধ্যের উপস্থিতি। আলু, আদা, পেঁয়াজ, ওল মাটির তলায় থাকলেও এদের গায়ে শাখামূল নেই বরং গায়ে কতগুলি দাগ থাকে সেগুলি আসলে পর্ব। পেঁয়াজ, আদার ক্ষেত্রে এই পর্ব থেকে পাতাগুলি বের হয়। তাই আলু, পেঁয়াজ, আদা ও ওল যে কান্ড তা বোঝা গেল।

আলু

আদা

পেঁয়াজ

ওল
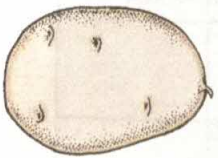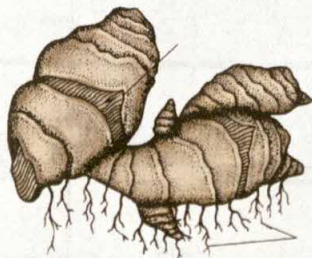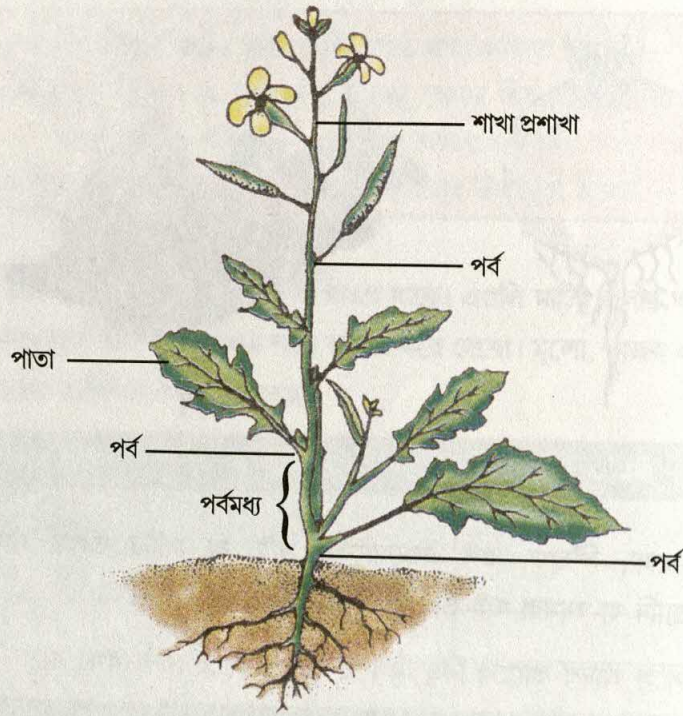
আদর্শকান্ড

সাধারণভাবে আমরা খাদ্য হিসাবে যা খাই তার মধ্যে উদ্ভিদের পাতা হিসাবে পালংশাক, পুঁইশাক, লাউশাক, পানপাতা, নিমপাতা ইত্যাদি থাকে। এই চ্যাপ্টা অংশগুলি যাদের রঙ সবুজ, কান্ডের গা থেকে বেরিয়েছে, সূর্যের দিকে নিজেদের মেলে রয়েছে সেগুলি হল পাতা।

তোমরা বিভিন্ন রকম পাতা সংগ্রহ করো। সব পাতাগুলি সম্ভবত একরকম নয়। তোমরা যা দেখলে তার ভিত্তিতে নীচের তালিকাটি পূর্ণ করো।

পাতার নাম	পাতার আকার	পাতার কিনারা	পাতার সামনের অংশ
১. পান পাতা	খানিকটা ডিমের মত বা ত্রিকোণাকার	সমান	আস্তে আস্তে ছুঁচালো হয়েছে
২.			
৩.			
৪.			

একটি পাতা নিয়ে তার কী কী অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লক্ষ্য করো —

একটি আদর্শ পাতার চিত্র

তোমাদের নিজেদের সংগ্রহ করা পাতাগুলি ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পাতার চওড়া, পাতলা, সবুজ অংশটি হল পত্রফলক। ফলকটি বোঁটা দিয়ে কান্ডের সঙ্গে যুক্ত। ফলকের মধ্যে সরু সুতোর মত অংশগুলি পাশাপাশি বা ডালের মত ছড়িয়ে থাকে — সেগুলি আসলে শিরা-উপশিরা।

এবার একটা মজার পরীক্ষা করে দেখো। যে গাছগুলির সংখ্যা যথেষ্ট বেশী এবং জংলা জাতীয়, তোমার বাড়ী বা স্কুলের পাশ থেকে এরকম একটি সবুজ কান্ড যুক্ত এবং অপরটি যার কান্ড সবুজ নয়, দুটি গাছ চিহ্নিত করো (টবেও গাছদুটি রাখা যেতে পারে)। গাছ দুটির সব পাতাগুলিকেই কালো কাগজ দিয়ে জেমস্ ক্লিপের সাহায্যে পুরোপুরি ঢেকে দাও।

তুমি যা দেখলে তা দিয়ে নীচের তালিকাটি পূরণ করো ঃ-

গাছ	সময়	কী ঘটল
১. সবুজ কান্ড যুক্ত গাছ	৫ দিন	
২. সবুজ নয় এমন কান্ড যুক্ত গাছ	৫ দিন	

খাদ্যের প্রয়োজনে যেমন আমরা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খাই, তেমনি উদ্ভিদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। উদ্ভিদের সবুজ পাতা ও দেহের অন্যান্য সবুজ অংশ সূর্যের আলো ব্যবহার করে খাবার তৈরী করে এবং তা দেহের বিভিন্ন অংশে জমিয়ে রাখে।

আমাদের খাদ্য তালিকাতে সাধারণভাবে কয়েকটি ফুলও আছে, যেমন বক, কুমড়ো, সজনে, ফুলকপি ইত্যাদি। তোমরা খাবার হিসাবে ব্যবহার কর এমন কয়েকটি ফুল ভাল করে দেখে নীচের তালিকাটি পূর্ণ করো।

ফুলের নাম	বোঁটা বা ডাঁটি	ডাঁটির গোড়ায় সবুজ অংশ (বৃতি)	পাপড়ি (থাকলে রঙ)	পুং কেশর	গর্ভ কেশর
১. বক ফুল	আছে	আছে	আছে এবং সাদা রঙ	আছে	আছে
২.					
৩.					
৪.					
৫.					

অনেকগুলি ফুল তোমরা নিজেরাই দেখলে। সব ফুলগুলি একই রকম নয়। কোন ফুলে হয়তো ডাঁটির গোড়ায় সবুজ অংশটি নেই, কারুর আবার পাপড়ি নাও থাকতে পারে। কোথাও আবার এগুলি থাকলেও পুংকেশর এবং গর্ভকেশরের যে কোন একটি বা দুটিই থাকতে পারে।

আদর্শ ফুলে বৃতি, পাঁপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর সবগুলি অংশই আছে তাই তারা সম্পূর্ণ ফুল। যে কোন একটি অংশ বা স্তবক না থাকলে সেই ফুলগুলি হল অসম্পূর্ণ ফুল।

তোমরা সবাই একটি সম্পূর্ণ ফুল (জবা/ধুতুরা) নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসবে। এবার তোমরা ফুলের বিভিন্ন অংশগুলি দেখো ঃ-

ধুতুরা ফুল ও এর ব্যবচ্ছেদিত বিভিন্ন অংশ
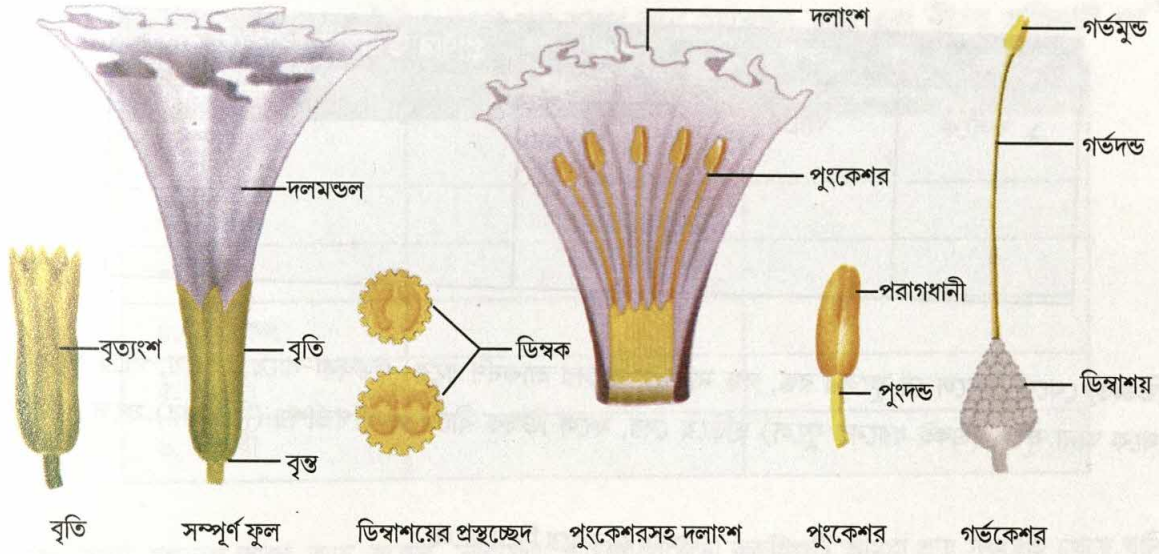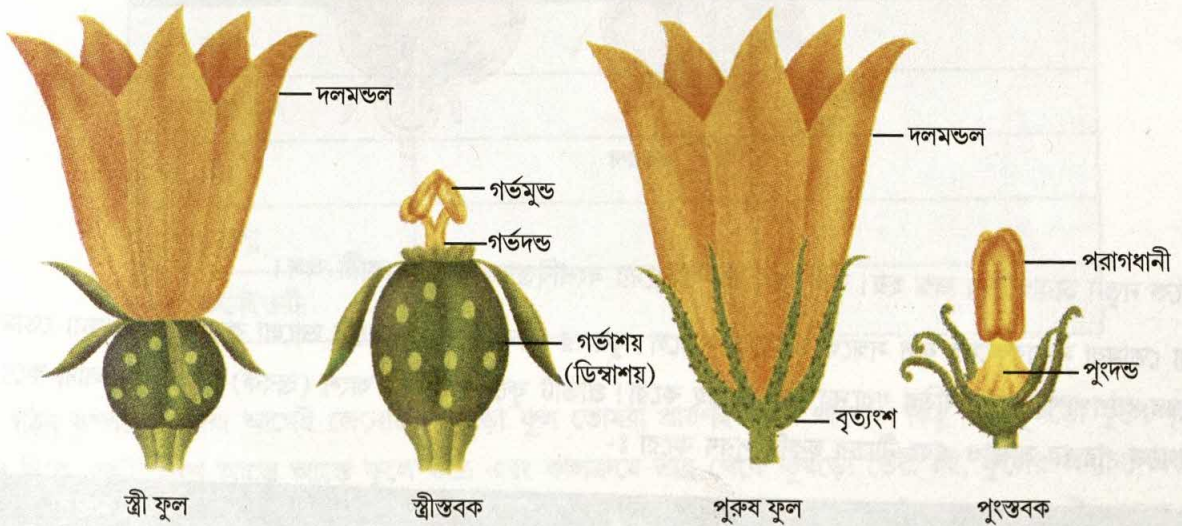
একটি অসম্পূর্ণ ফুল — কুমড়ো ও এর বিভিন্ন অংশ

অতএব ফুলের গঠনের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা গেলেও একটি আদর্শ ফুল বৃতি, উপবৃতি, দলমন্ডল, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র নিয়ে গঠিত। দলমন্ডল অনেকগুলি দল বা পাপড়ি নিয়ে তৈরী। পুংকেশরচক্রে পরাগধানীর ভেতরে পরাগরেণু এবং গর্ভকেশরচক্রে গর্ভাশয়(ডিম্বাশয়)-এর মধ্যে ডিম্বক থাকে।

নিজের বাড়ীতে বা স্কুলের বাগানের গাছের ফুলগুলিকে বেশ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করে নিচের তালিকাটি পূরণ করার চেষ্টা করো ঃ-

ফুল	রঙ	গন্ধ	প্রাণীর উপস্থিতি (থাকলে নাম)
১. কলকে	আছে	আছে	হ্যাঁ, মৌমাছি, বোলতা

তোমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখলে যে ফুলের রঙ, গন্ধ নানা পতঙ্গদের আকর্ষণ করে। পতঙ্গরা পায়ে, ডানায়, গায়ে ফুলের রেণু মেখে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে (একই ধরনের ফুলে) ছড়িয়ে দেয়, ফলে ডিম্বক বীজে এবং গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) ফলে পরিণত হয়।
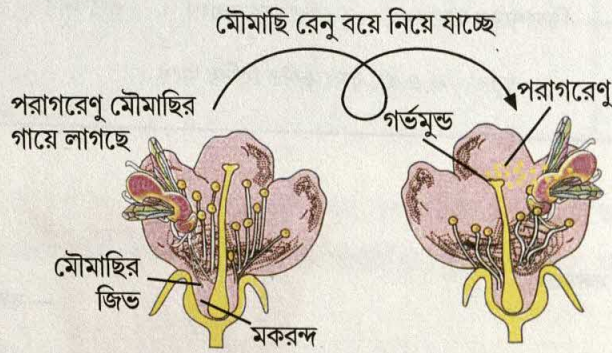
বীজ থেকে নতুন চারাগাছের জন্ম হয়। তাই ফুল হল উদ্ভিদের বংশবিস্তারের সাহায্যকারী অঙ্গ।

ইতিমধ্যে তোমরা নানারকমের ফুল সম্বন্ধে জানতে পারলে। ফুলের গঠন সম্পর্কে আরো ভালো করে জানার জন্য তোমরা বাড়ী বা বিদ্যালয়ের আশপাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের ফুল সংগ্রহ করো। প্রতিটি ফুলের প্রতিটি অংশ (স্তবক) আলাদা আলাদা করে একটি বড় সাদা কাগজে পরপর সাজাও এবং নীচের ছকটি পূরণ করো ঃ-

ফুলের নাম	সংখ্যা				মন্তব্য
	বৃত্যংশ	পাপড়ি	পুংকেশর	গর্ভকেশর	
১. কুমড়ো	৫টি	৫টি	৩টি	—	পুরুষফুল
২.					
৩.					
৪.					

আমাদের খাদ্য তালিকাতে সাধারণভাবে ফলও আছে, যেমন আম, জাম, লিচু, সবেদা, আপেল, পেয়ারা, আতা, কাঁঠাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তোমরা মটরশুটি, সবেদা, নারকেল, আম, কাঁঠাল, আতা ফল সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করো এবং নীচের তালিকাটি পূর্ণ করো।

ফলের নাম	রসালো	রসবিহীন
১. মটরশুটি		✓
২. আম		
৩. আতা		
৪. নারকেল		
৫. সবেদা		
৬. সুপারী		

কাঁচা বা ভাজা ছোলা, মুগডাল ভাজা, আম, সবেদা, নারকেল, শীতকালে কাঁচা কড়াইশুটি আমরা প্রায় সকলেই খেয়ে থাকি। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে নিচের তালিকাটি পূর্ণ করো —

উদাহরণ	ফল	বীজ
১. আম	✓	—
২. নারকেল		
৩. গম		
৪. ছোলা		
৫. কড়াইশুটি		

ফুলের গঠন সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। কুমড়ো ফুল তোমরা প্রায়শই দেখে থাকবে। কিছু কিছু কুমড়ো ফুলে বৃন্তের উপরে গোড়ার দিকে একটি অংশ আস্তে আস্তে ফুলে ওঠে এবং কালক্রমে তার থেকে কুমড়ো তৈরী হয়, ফুলের অন্যান্য অংশগুলি ঝরে যায়। এটি স্ত্রী ফুল। পরাগমিলনের পর ডিম্বাশয় থেকে কুমড়ো অর্থাৎ ফলটি তৈরী হয় যার ভিতরে দানা বা বীজ থাকে।

আসলে ফল হ'ল নিষেকের পর ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন অংশ যা বীজকে ধরে রাখে। ডিম্বাশয়ের প্রাচীর থেকে ফলের ত্বক উৎপন্ন হয়। তোমাদের পর্যবেক্ষণ থেকেই দেখা গেল যে কোন কোন ফলের ফলত্বক রসবিহীন হয়। তারা হ'ল নীরস বা শুষ্ক ফল। নারকেলের ছোবড়া হ'ল শুষ্ক তাই এটি নীরস ফল। আবার আমাদের প্রিয় ফল আমের ফলত্বক স্থূল ও রসাল — এটি রসাল ফল।

স্ত্রী ফুল

আম

নারকেল
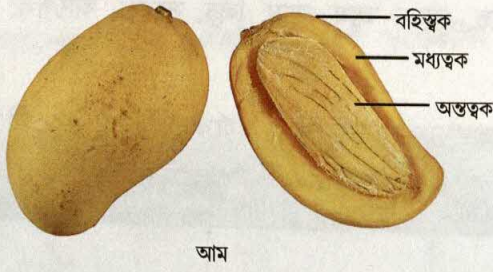
একটি সবুজ কাঁচা আমকে মাঝখান দিয়ে লম্বা করে কেটে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে তালিকাটি পূর্ণ করো।

অংশ	বর্ণ	নমনিয়/কঠিন	রসের উপস্থিতি	খাদ্যযোগ্য
১. একেবারে বাইরের অংশ	সবুজ	কঠিন	নেই	কাচা অবস্থায় খাওয়া হলেও পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়না
২. ভেতরের অংশ ও বাইরের ত্বকের মাঝখানের অংশ				
৩. একেবারে ভেতরের অংশের বাইরের পাতলা স্তর				
৪. একদম ভেতরের স্তর				

উপরের পর্যবেক্ষণ থেকে তোমরা বুঝতে পারছো আম স্থূল ও রসালো হয়, অতএব এটি একটি রসাল, সরল, আদর্শ ফল। এক প্রকোষ্ঠ যুক্ত ডিম্বাশয় থেকে আম উৎপন্ন হয়।

আদর্শ সরল ফলের ফলত্বক তিনটি স্তর দিয়ে গঠিত — বহিস্ত্বক (এপিকার্প), মধ্যস্ত্বক (মেসোকার্প) — এই রসাল অংশটি মূলতঃ আমাদের খাদ্য এবং অন্তস্ত্বক (এন্ডোকার্প) — ফলের সব থেকে ভেতরের শক্ত কাষ্ঠল অংশ।
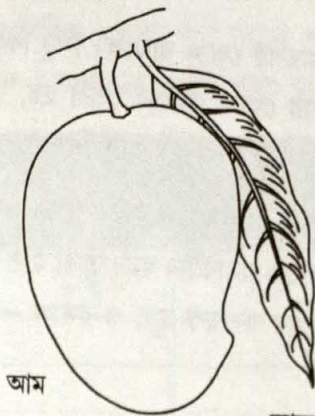
আমের গঠন
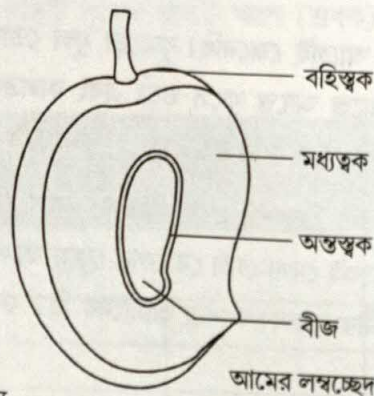
ফলের কাজ বীজকে ধরে রাখা। আম যেমন একটি ডিম্বাশয় (এক প্রকোষ্ঠ যুক্ত) থেকে তৈরী হয়, প্রকৃতিতে তেমন কোনো কোনো ফল আছে যেখানে অনেকগুলি ফুলের ডিম্বাশয় থেকে একটি ফল তৈরী হয়। এই ফল এমনভাবে তৈরী হয় যার মধ্যে একক ফলগুলি বাইরে থেকে একটি আবরণে ঢাকা থাকে। এগুলি হ'ল যৌগিক ফল।

তোমরা অনেকেই কাঁঠাল খেয়েছো। কাঁঠালের একেবারের বাইরের খোসা বা আবরণের ভিতরে যে এক-একটি কাঁঠালের কোয়া থাকে তারা এক-একটি ফুল থেকে তৈরী হয়। তারা এক-একটি আসলে ফল। এক্ষেত্রে অনেকগুলি ফুল একটি সাধারণ অক্ষে যুক্ত অবস্থায় থাকে এবং সবকটি ফুলই ফলে পরিণত হবার সময় একটি সাধারণ আবরক দ্বারা আবৃত থাকে। তাই কাঁঠাল একটি যৌগিক ফল।

আম-কাঁঠালের মত আতাও আমাদের একটি পরিচিত ফল। আতা কিন্তু গঠনে আম (সরল) ও কাঁঠাল (যৌগিক) —এর থেকে অন্যরকম। প্রকৃতিতে কিছু কিছু ফুলে অনেকগুলি ডিম্বাশয় থাকে, যারা পরস্পর থেকে পৃথক। পরাগমিলন এবং নিষেকের পর এই ধরনের ফুল থেকেই এমন ফল তৈরী হয় যার মধ্যে অনেকগুলি ফল একসঙ্গে গুচ্ছাকারে থাকে। এই ধরনের ফলই হ'ল গুচ্ছিত ফল। অতএব আতা একটি গুচ্ছিত ফল।

আতা (গুচ্ছিত ফল)
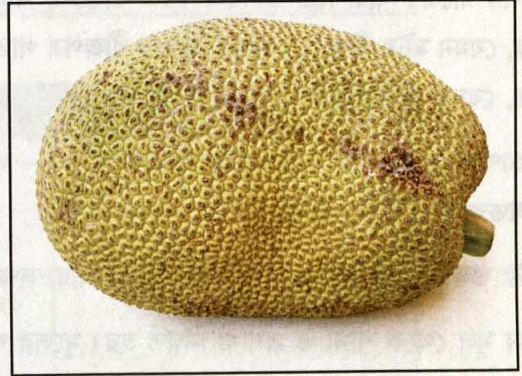
কাঁঠাল

আমরা যা শিখলাম

- আমাদের খাদ্যতালিকায় অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে।
- কোন উদ্ভিদের মূল, কোন উদ্ভিদের কান্ড, কোন উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল, বীজ সবই মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্য।
- পরাগমিলনের (নিষেকের পর) মাধ্যমে, **ডিম্বক থেকে বীজ** উৎপন্ন হয় এবং **ডিম্বাশয় থেকে ফল** উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে বীজ থাকে।
- **বীজ, বীজত্বক ও অন্তর্বীজ** নিয়ে গঠিত হয়। **অন্তর্বীজ** আবার **বীজপত্র ও ভ্রূণাক্ষ** নিয়ে গঠিত।
- **ভ্রূণাক্ষের** যে অংশ থেকে ভবিষ্যত শিশু উদ্ভিদের **মূল** গঠিত হয়, তাকে **ভ্রূণমূল** বলে এবং যে অংশ থেকে শিশু উদ্ভিদের **কান্ড** গঠিত হয়, তাকে **ভ্রূণমুকুল** বলে।
- যে সব বীজের **বীজপত্রে** ভবিষ্যত শিশু উদ্ভিদের **খাদ্য** সঞ্চিত থাকে তাদের আলাদা **সস্য গঠিত হয় না**। এদের বলে **অসস্যল বীজ,** যেমন মটর বীজ। যে সকল বীজের বীজপত্র পাতলা এবং শিশু উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চয়কারী **সস্য গঠিত** হয়, তাদের বলে **সস্যল বীজ,** যেমন ভূট্টাবীজ।
- সাধারণভাবে উদ্ভিদের **কান্ড মাটির ওপরে** থাকে — তারা **বায়বীয় কান্ড,** কিছু কিছু উদ্ভিদের **কান্ড মাটির ভেতরে** থাকে — তারা **মৃদ্গতকান্ড**। কান্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে।
- মাটির তলার কিছু মূল ও কিছু কান্ড **বাড়তি খাদ্য সঞ্চয়** করে স্ফীত হয়।
- প্রধান মূল থেকে শাখা ও প্রশাখা নির্গত হয়। মূলের শাখা থেকে **মূলরোম** ও শাখাগুলির প্রান্ত ভাগে **মূলত্র** থাকে। মাটির তলার মূলের থেকে শাখা-প্রশাখা নির্গত হয়।
- কান্ড থেকে বেরিয়ে আসা চ্যাপ্টা প্রসারিত ক্লোরোফিল যুক্ত সবুজ অংশগুলি হল পাতা। পাতা হল উদ্ভিদের খাদ্য তৈরী করবার প্রধান স্থান। যদিও উদ্ভিদের যে কোনো ক্লোরোফিল যুক্ত সবুজ অংশই সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরী করতে পারে।
- কান্ডের শাখা-প্রশাখা থেকে বেরিয়ে আসা **ফুল** সাধারণত **বৃতি, পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর** নিয়ে তৈরী। ফুল উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে সাহায্যকারী অংশ।
- ফলের **ফলত্বক রসবিহীন** হলে, তাকে বলে **নীরস ফল**। অন্যদিকে **ফলত্বক রসাল** হলে, তাকে বলে **রসাল ফল**।
- আদর্শ সরল **ফলের ফলত্বক বহিস্ত্বক** (এপিকার্প), **মধ্যস্ত্বক** (মেসোকার্প) এবং **অন্তস্ত্বক** (এন্ডোকার্প) নিয়ে গঠিত।
- আম সরল ফল, কাঁঠাল যৌগিক ফল এবং আতা গুচ্ছিত ফলের উদাহরণ।

নিজে করে দেখো

ক)

উদ্ভিদের যে অংশ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
১. মূল	
২. কান্ড	
৩. পাতা	
৪. ফুল	
৫. ফল	
৬. বীজ	

খ)

বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদের অঙ্গ
১. রোম যুক্ত, লবণ ও জল শোষণ করে	
২. পর্ব ও পর্বমধ্য যুক্ত অংশ	
৩. শিরা-উপশিরা সমন্বিত চ্যাপ্টা প্রসারিত ফলক যা খাদ্য সংশ্লেষ করে	
৪. বৃতি, পাপড়ি, পুংকেশর, গর্ভকেশর যুক্ত; বংশ বিস্তারে সাহায্য করে	
৫. ফুলের ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন যা বীজ ধারণ করে বা যার মধ্যে বীজ থাকে	
৬. ফুলের ডিম্বক থেকে উৎপন্ন যে অংশ থেকে নতুন চারাগাছ উৎপন্ন হয়	

গ)

বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. গাছের মূল সাধারণত মাটির নীচে থাকে, তবে মাটির ওপরেও দেখতে পাওয়া যায়।	
২. গাছের কান্ড সাধারণত মাটির ওপরে থাকে, তবে মাটির নীচেও থাকতে পারে।	
৩. কান্ড, কিন্তু খাদ্য সংশ্লেষে সক্ষম।	
৪. এমন ফুল যাতে পুং অথবা স্ত্রী যে কোনো একটি স্তবক থাকে না।	
৫. কিছু ফল আছে, যারা ডিম্বাশয় সহ ফুলের অন্যান্য অংশ থেকে সৃষ্টি হয়।	
৬. যে বীজের বীজপত্রে চারাগাছের জন্য খাদ্য জমা থাকে এবং বীজপত্রের সংখ্যা দুটি।	

ঘ) ছবি দেখে তালিকাটি পূর্ণ করো

অংশ	নাম
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
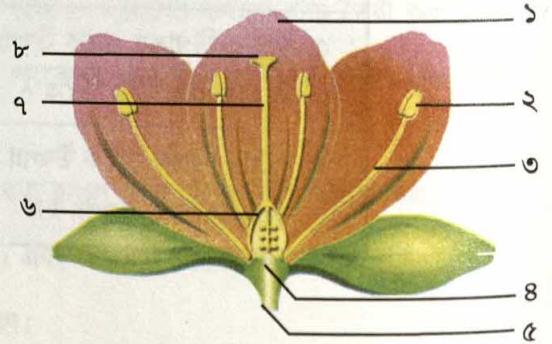
ঙ) তালিকাটি পূর্ণ করো

বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে না	
২. বীজপত্রের সংখ্যা একটি	
৩. বীজপত্রের সংখ্যা দুটি	
৪. বীজের বীজপত্রের বাইরে চারা উদ্ভিদের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে।	

চ) ছবি দেখে তালিকাটি পূর্ণ করো।
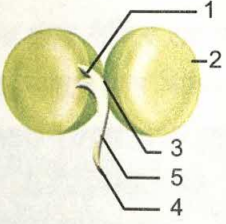
অংশ	নাম
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

অনুশীলনী

ক) নিচের উত্তরগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।

১. নীচের কোনটি দানাশস্য নয়?

ক) ধান

খ) গম

গ) ডাল

ঘ) গাজর

২. নীচের যে অংশটি প্রধানমূলে অনুপস্থিত

ক) শাখামূল

খ) মূলত্র

গ) পর্বমধ্য

ঘ) মূলরোম

খ) শূন্যস্থান পূরণ করো —

১. আদা হ'ল একটি —————— জাতীয় কান্ড।

২. পাতা নয় তবু সালোকসংশ্লেষে সক্ষম এমন একটি উদ্ভিদ অঙ্গ ——————————।

৩. কুমড়ো গাছের যে ফুলটি থেকে কুমড়ো উৎপন্ন হয়, সেটি হ'ল —————————— ফুল।

গ) বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভ মেলাও —

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
১. মূল	১. ফুলের সবুজ বৃতি
২. পরাগমিলন	২. আম
৩. উদ্ভিদের খাদ্যসংশ্লেষ	৩. গাজর
৪. রসাল মধ্যত্বক	৪. নারকেল
	৫. মৌমাছি

ঘ) পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও —

১. আদর্শ সরল ফলে ফলত্বক কী কী স্তবক নিয়ে গঠিত?

২. নারকেলকে নীরস ফল বলে কেন?

৩. পার্থক্য লেখো — সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল।

ঙ) ১. মাটির তলায় থাকে, তবু আলু হ'ল কান্ড — কারণ বলো।

২. কাঁঠাল একটি যৌগিক ফল — যুক্তি দাও।

৩. গমের বীজপত্র খুব পাতলা অথচ ছোলার স্থূল — কারণ ব্যাখ্যা করো।

কয়েকটি পরিচিত প্রাণীর স্বভাব, বসতি ও বাহ্যিক গঠন

পতঙ্গ ঃ আরশোলা

আমাদের কাজ ১

প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাড়ীতে বা বাড়ীর আশেপাশে আরশোলার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করবে এবং নীচের ছক পূরণ করবে। যে সকল শিক্ষার্থী একাধিক দিনের প্রচেষ্টায় নিতান্তই আরশোলা দেখতে পাবে না তারা শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবে।

নীচের ছকে বাঁদিকে প্রশ্ন তারপর সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা লিখে দেওয়া আছে। তার সাথে তোমার বক্তব্য মিলে গেলে সেই ঘরে ✓ চিহ্ন দেবে, নাহলে ডান দিকের শূন্য ঘরে তোমার অভিজ্ঞতা লিখবে।

আরশোলা কোথায় দেখেছো?	রান্নাঘরে	আসবাব পত্রের নিচে	আবর্জনার স্তুপে	উঠোনে বা রাস্তায়	তোমার অভিজ্ঞতা
কখন দেখেছো?	ভোরবেলায়	দুপুর বেলায়	সন্ধেবেলায়	রাত্রে	
কী রকম অবস্থায় দেখেছো?	উড়ে বেড়াচ্ছিল	হাঁটছিল	দেওয়ালে বসেছিল	গর্ত থেকে মুখ বার করেছিল	
কী রকম মাপের (size) ছিল?	খুব বড়	মাঝারি	ছোট	খুব ছোট	
তার দেহে তীব্র আলো (টর্চের আলো) ফেললে কী করল?	ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল	খুব ধীরে ধীরে হেঁটে সরে গেল	দ্রুত অন্ধকারে সরে গেল	উড়তে শুরু করল	
কী খেতে দেখেছো?	পাঁউরুটি	ভাত, তরকারী	চাল, ডাল অথবা কাঁচা সব্জীর টুকরো	কোন তরল যেমন তেল, জল, দুধ	

আমাদের কাজ ২

প্রতি চারজন শিক্ষার্থীর দল একটি করে আরশোলা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করবে (শ্রেণি কক্ষের কাজ)।

রঙ ও দেহের আকৃতি	
পায়ের সংখ্যা	
পাগুলি দেখতে কী রকম	
ক’ জোড়া ডানা এবং ডানাগুলো কোথা থেকে বেরিয়েছে	
নমুনাটি উল্টিয়ে দেখলে দেহে কী কী দেখা যাচ্ছে	
মাথার আকৃতি কেমন, সেখানে কী কী দেখা যাচ্ছে	
চোখ দুটি কেমন	
মাথার সামনে সরু সুতোর মত অঙ্গ কটা আছে	
মুখের দু পাশে কী দেখা যাচ্ছে	

(আরশোলা হাতে নিয়ে দেখার জন্য গ্লাভস বা অন্য কিছু দিয়ে হাত ঢেকে নেওয়া ভাল। আরশোলায় হাত দিলে ভালো করে হাত ধুয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়)

আমাদের কাজ ৩

বাড়ীতে আরশোলা ছাড়া অন্যান্য যা যা পতঙ্গ (পোকা) সারাদিনে দেখতে পেয়েছো তার তালিকা তৈরী করো (বাড়ীর কাজ)।

সময়	পোকার নাম
সকাল বেলা	
দুপুর বেলা	
বিকেল বেলা	
রাত্রি বেলা	

নিচের প্রাণী দুটির কী কী মিল ও কী কী অমিল দেখতে পাচ্ছ লিখবে।

নাম ঃ-	নাম ঃ-
মিল ঃ- ১। ২। ৩।	
অমিল ঃ- ১। ২। ৩।	

আরশোলার স্বভাব

- সাধারণত একা থাকে না। একাধিক আরশোলা দলবদ্ধ ভাবে থাকে।
- আরশোলা সাধারণতঃ অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় থাকতে ভালোবাসে।
- জোরালো আলো থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়।
- একটি আরশোলা নিজের চলার পথে দেহ থেকে নিঃসৃত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ (ফেরোমোন) ছড়াতে ছড়াতে যায়। ঐ পদার্থের গন্ধ শুঁকে অন্য আরশোলারা তাকে অনুসরণ করতে পারে।
- আরশোলার ডানা থাকলেও এরা ওড়ে কম বরং পায়ের সাহায্যে জোরে দৌড়ায়।

বাসস্থান

- বাড়ীতে রান্নাঘরের আনাচে কানাচে আর আসবাব পত্রের নীচে দলবদ্ধ ভাবে বাস করে।
- বাগানে, জঙ্গলে শুকনো জমা পাতার নীচে এরা দলে দলে বাস করে।
- নোংরা আবর্জনা এদের বসবাসের উপযোগী জায়গা।
- তবে মনে করা হয় আরশোলা এমন এক প্রাণী যা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় (উত্তর ও দক্ষিণমেরু ছাড়া), যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

বাহ্যিক গঠন

- দেহ চ্যাপ্টা ও চওড়া মাকু আকৃতির। উল্টোদিক থেকে দেখলে অনেকগুলো খন্ডযুক্ত দেহ বোঝা যাবে।
- তিন জোড়া (ছয়টি) পা আছে। পাগুলোয় কয়েকটা খন্ড পর পর জোড়া। তাই এরা সন্ধিপদী প্রাণী।
- দু জোড়া ডানা আছে। দুটো বড় শক্ত ডানার নীচে পাতলা ছোট দুটি ডানা থাকে।
- মাথা ছোট।
- মাথার সামনে সরু লম্বা শুঁড় বা অ্যানটেনা আছে।
- মাথায় দুটি বড় পুঞ্জাক্ষী (অনেক গুলো ছোট ছোট চোখ এক সাথে) আছে।
- মাথার নীচের দিকে মুখগহ্বর খাবার চেবানোর জন্য কতগুলো উপাঙ্গ দিয়ে ঘেরা।

পৃষ্ঠ দৃশ্য

অঙ্কীয় দৃশ্য
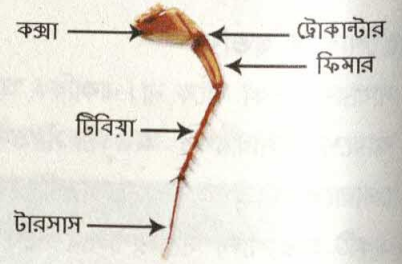
একটি পা
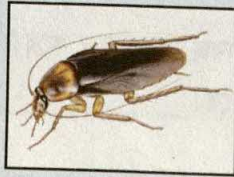
পূর্ণাঙ্গ আরশোলা

মুখ গহ্বর

আরশোলা পতঙ্গ। কারণ — এদের দেহে মস্তক, বক্ষ আর উদর তিনটি ভাগ আছে। খন্ড যুক্ত তিন জোড়া পা আছে। দুজোড়া ডানা আছে। পুঞ্জাক্ষী আছে। মুখ গহ্বরের চার পাশে উপাঙ্গ আছে।

আরশোলার খাদ্যাভ্যাস

আরশোলা কী না খায়! প্রাণীদের খাদ্য তো খায়ই, প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহের অংশও খেতে পারে। তাছাড়াও সাবান, কাগজ, কাপড়, গঁদ, প্রাণীর মলমূত্র এমনকি নিজেদের ডিমের খোলস, নিজেদের দেহের ছেড়ে দেওয়া খোলস সব খায়। এক কথায় এদের সর্বভুক বলা যায়।

আরশোলার পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা
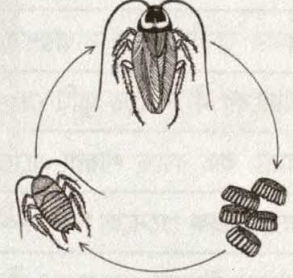
- আরশোলার ডিম শক্ত গাঢ় বাদামি রঙের চামড়ার খোলসের মধ্যে থাকে। দেখতে অনেকটা ক্যাপসুলের মত। এই খোলসের মধ্যে থাকার জন্য ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় থাকলেও ডিম ভিজে নষ্ট হয় না।
- ডিম ফুটে বেরুনো বাচ্চাগুলোর চামড়া সাদা ও নরম। এরা ডিম থেকে বড় পূর্ণ আরশোলা হতে প্রায় তিন মাস সময় নেয়।
- আরশোলার দেহ শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে এবং মাথার সামনের সরু চুলের মত অ্যানটেনা দিয়ে অনুভব করতে পারে।

আরশোলা খাবারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পর সেই খাবার খেলে নানান রকম পেটের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। আরশোলার দেহ থেকে যে রস বেরোয় তা গায়ে লাগলে এ্যলার্জি হতে পারে। তাই রান্না ঘর, শোবার ঘর পরিষ্কার ও আরশোলা মুক্ত রাখা উচিত।

আরশোলা অমেরুদন্ডী, সন্ধিপদী, পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণী।
আরশোলার বিজ্ঞান সম্মত নাম *Periplaneta americana*

পাখি ঃ পায়রা

বাড়ির চারপাশে অনেক পাখি উড়তে দেখো। পায়রাও দেখেছো নিশ্চয়ই। আর একবার ভালো করে পায়রাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করো, তারপর নীচের ছকে তোমার দেখা অভিজ্ঞতাগুলো লেখো।

(যে শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করেও পায়রা দেখতে পাবে না তারা যে পাখি বাড়ীর কাছে দেখতে পাচ্ছ সেটাই ভালো করে দেখো তারপর শ্রেণিকক্ষে এসে যে সকল সহপাঠী পায়রা দেখেছে তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে ছক পূরণ করো।)

আমাদের কাজ ১ (বাড়ীর কাজ)

সারাদিনে কখন পায়রা দেখতে পাও?	
পায়রা একা একা থাকে, না দলে থাকে?	
তোমার বাড়ীর কাছে সাধারণত কী রঙের পায়রা দেখতে পাও?	
পায়রাদের কী করতে তুমি দেখেছো?	
তোমার কত কাছে পায়রা এসেছে?	
পায়রার ডাক শুনেছো? কী রকম করে ডাকে?	
পায়রাকে উড়তে দেখেছো? কীভাবে ওড়ে?	
তাদের বাসা কোথায়?	
পায়রাকে জল খেতে দেখেছো?	
অন্য পাখিদের থেকে পায়রার জল খাওয়ার ধরন আলাদা কী ভাবে?	

- পায়রা মানুষের খুব কাছাকাছি আসে। হাত থেকে দানা শস্য খেয়ে যায়।

- পায়রা যখন ওড়ে খুব দ্রুত ডানা ঝাপটায়। মাঝে মাঝে এরোপ্লেনের মত ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

- মানুষের বসতির কাছাকাছি বাগানে, বাড়ীর আনাচে কানাচে, বাড়ীর ছাদে, কার্নিশের ফাঁক ফোকরে কাঠি, পাতার টুকরো দিয়ে এরা বাসা বানায়। সেখানে ডিম পাড়ে।

আমাদের কাজ ২

তোমার দেখা পায়রার সম্বন্ধে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (শ্রেণির কাজ)।

পায়রাকে আমরা পাখি বলি কেন?	
ক'টা পা দেখেছো? পায়ের আঙুলগুলো কেমন?	
দেহটার আকৃতি কেমন? দেহে কী কী দেখতে পেয়েছ?	
দেহ কী দিয়ে ঢাকা?	
মাথার অংশটা কেমন? মাথায় কী কী আছে?	
ডানা ক'টা? ডানায় কী আছে?	
ঠোঁট কী রকম?	
লেজে কী কী আছে? লেজটা দেখতে কেমন?	

- পায়রার ঘাড়ের হাড়ের গঠন এমন যে পায়রা পেছন দিকে অনেকটা বেশি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পারে।
- চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অনেক উপরে উড়তে উড়তে নীচের জিনিষ দেখতে পায়।
- পায়রার মুখের সামনের দিকে চোয়াল দুটো বেরিয়ে এসে ছোট্ট ঠোঁট বা চঞ্চু (Beak) তৈরী হয়েছে। চঞ্চুর ওপর সাদা প্যাডের মত অংশের নাম সিরি। চঞ্চুতে কোনো দাঁত থাকে না। এরা চঞ্চুর সাহায্যে দানা শস্য খুঁটে খায়।
- ডানা ও লেজের পালক বড় আর দেহের বাকি অংশ ছোট পালক দিয়ে ঢাকা।
- ওড়ার জন্য পায়রার সামনের পা দুটো ডানা হয়ে গেছে।
- পায়ে চারটে আঙুল। সামনের দিকে তিনটে আর পেছন দিকে একটা, আঙুলে ধারালো বড় বড় নখ আছে।
- শরীরে মেরুদন্ড ও অন্যান্য হাড় আছে। তাই এরা মেরুদন্ডী প্রাণী। দেহের হাড় খুব হালকা।
- পায়রা মাটিতেও হাঁটে আবার আকাশেও ওড়ে, তাই অন্যান্য পাখীদের মত পায়রাও খেচর প্রাণী।

আমাদের কাজ ৩

পায়রার সামনে বিভিন্ন রকম খাবার আলাদা আলাদা করে রেখে তার খাবারের পছন্দের তালিকা তৈরী করে পায়রার খাদ্যাভ্যাস লক্ষ্য করো।

পায়রাকে খেতে দেওয়া হল	ভাত, কাঁচা লঙ্কা, মুড়ি, কাঁচা সব্জি, ধান, গম, নুন, চাল, আটার রুটি, দানা, শস্য, চিনি ... ...
পায়রা কী কী খেল?	

আমাদের কাজ ৪

পায়রার সাথে তোমার দেখা যে কোনো একটি পাখির তুলনা করে নীচের ছক ভর্ত্তি করো।

পায়রা	তোমার দেখা যে কোনো পাখির নাম...
স্বভাব ঃ	
মিল ১।	অমিল ১।
২।	২।
৩।	৩।

পায়রা	তোমার দেখা যে কোনো পাখির নাম...
আকৃতি ও রঙ ঃ	
মিল ১।	অমিল ১।
২।	২।
৩।	৩।

জানো কি?

- মানুষ সাদা পায়রাকে শান্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। শান্তি কামনায় আকাশে সাদা পায়রা ওড়ানো হয়।

- ডাক ও তার (Post and Telegraph) বিভাগ তৈরী হওয়ার আগে পায়রার সাহায্যে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতো।

- ডিম ফুটে বাচ্চা বার হওয়ার পর বাবা ও মা দুই পায়রাই তাদের খাদ্যনালী থেকে নিঃসৃত সাদা দুধের মত ঘন তরল তাদের বাচ্চাদের প্রথম সপ্তাহটায় খাওয়ায়। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বাচ্চারা শস্য দানা খেতে শুরু করে। বাচ্চাকে বড় করতে পায়রা বাবা মা দুজনে সমান দায়িত্ব পালন করে।

পায়রা মেরুদন্ডী, পক্ষী শ্রেণির প্রাণী।
পায়রার বিজ্ঞান সম্মত নাম *Columba livia*

আমরা যা শিখলাম

আরশোলা

- অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা জায়গায় আরশোলার বাস।
- দেহের চামড়া প্রসারিত হয়ে আরশোলার দু জোড়া ডানা তৈরী হয়েছে।
- তিন জোড়া সন্ধিযুক্ত পা আছে।
- ডানার সাহায্যে উড়তে পারে আর পায়ের সাহায্যে দ্রুত গমন করে।
- দেহ মাথা বক্ষ আর উদর এই তিন খন্ডে বিভক্ত।
- আরশোলা সন্ধীপদী পর্বের পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণী।

পায়রা

- পায়রা সাধারণতঃ জনবসতি এলাকায় থাকে।
- সামনের পা ডানায় পরিণত হয়েছে।
- সারা দেহ পালকে ঢাকা।
- দুটি পায়ে চারটে করে আঙ্গুল এমন ভাবে থাকে যাতে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে বসতে পারে।
- অনেকক্ষণ আকাশে উড়তে পারে।
- দানা শস্য খায়।
- দেহে হাড় আছে।
- মেরুদন্ডী, পক্ষী শ্রেণির প্রাণী।

অনুশীলনী

১) নিচের ছবিতে অনেকগুলো সন্ধিপদী প্রাণী আছে, তার মধ্যে যেগুলো পতঙ্গ সেগুলোকে পেনসিল দিয়ে গোল দাগ দাও।
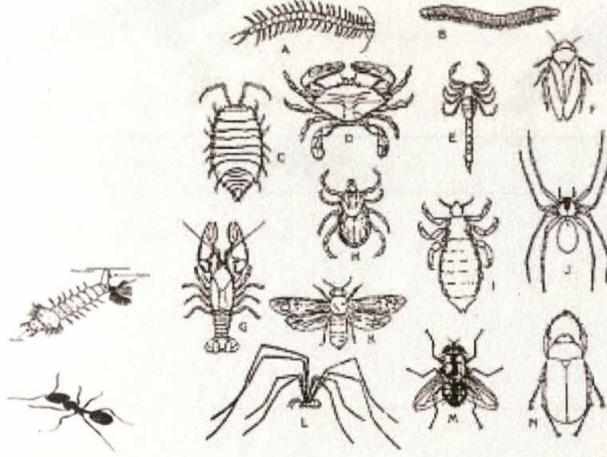
২) সূত্র অনুযায়ী পোকার নাম লেখো	
এরা যদি বসে খাবারে, পেটের অসুখ হতেই পারে।	(দু অক্ষর)
রঙের বাহার বাগানে ওড়ে ফুলে বসে ডানা মুড়ে।	(চার অক্ষর)
রান্নাঘরে, অন্ধকারে, আবর্জনায় থাকতে পারে।	(চার অক্ষর)
রাতে মশারি টাঙ্গিয়ে শোবে, নইলে ওদের কামড় খাবে।	(দু অক্ষর)

৩) আরশোলার বিভিন্ন অংশের নাম লেখো
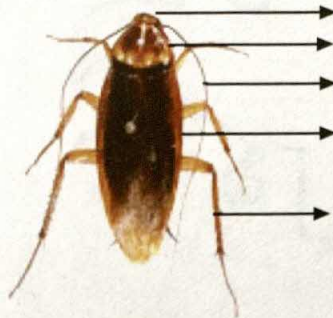
৪) ছবির পাখি দুটোর নাম লিখে তাদের তিনটে মিল আর তিনটে অমিল লেখো।

পাখির নাম ঃ-	পাখির নাম ঃ-
মিল ঃ- ১। ২। ৩।	
অমিল ঃ- ১। ২। ৩।	

৫) নীচের পায়রার ছবিটা সম্পূর্ণ করে আঁকো আর চোখ, চঞ্চু, ডানা, লেজ আর পা চিহ্নিত করো।
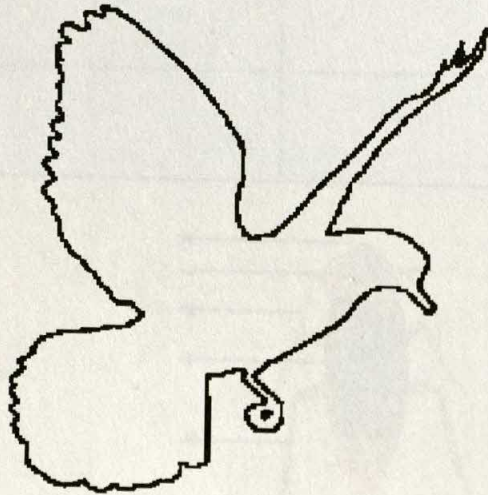
৬) ক) আরশোলা কোথায় থাকতে ভালোবাসে?

খ) আরশোলা কী খায়?

গ) কী কী বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য আরশোলাকে পতঙ্গ বা পোকা বলবে?

ঘ) আরশোলার ছবি এঁকে মস্তক, বক্ষ, উদর, শুঁড় বা অ্যানটেনা, ডানা আর পা চিহ্নিত করো।

ঙ) পায়রাকে একটা পাকা ফল আর চাল খেতে দিলে কোনটা খাবে?

চ) কী কী বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য পায়রাকে পাখি বলবে?

ছ) পায়রাকে কোথায় থাকতে দেখো?

আমাদের কয়েকটি উপকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী

কয়েকটি তন্তুপ্রদায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণী

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে সর্বদাই সুতো বা দড়ি ব্যবহার করে থাকি। তোমরা একটু ভেবে দেখতো, কীভাবে কোন কোন কাজে আমরা তন্তু/সুতো/দড়ি ব্যবহার করি।

আমাদের কাজ ১

তোমরা যে সমস্ত কাজে বা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের তন্তু, সুতোর বা দড়ির ব্যবহার দেখেছো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো —

সারণী-১ ঃ-

	ব্যবহার
সুতো	জামা, কাপড়, চাদর, ...
দড়ি	বস্তা, পাপোশ, ...

এই তালিকাটির অনুরুপ একটি তালিকা তোমাদের খাতায় বানাও এবং পূরণ করো।

আমাদের কাজ ২

তাহলে তোমরা দেখলে আমাদের জীবনে তন্তুর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তন্তু বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরী করে। তাই এদের প্রকৃতি যাচাই করার জন্য দর্জির দোকান বা বাড়ি থেকে কয়েক ধরনের কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করো। সেই টুকরোগুলিকে স্পর্শ করে অনুভব করো। আবার একটু ভালো করে ভেবে বলো ঐ সব টুকরোগুলো কী প্রকৃতির।

সারণী-২ ঃ-

তন্তু	কী ধরনের
১. সুতি	
২. রেশম	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছো কেন বিভিন্ন কাপড়ের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের? আমরা জানি এইসব কাপড়ের টুকরোগুলি তন্তু/ সুতো দিয়ে তৈরী হয়, তাই খুব ভালো করে দেখলে কাপড়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তন্তু / সুতোর ব্যবহার বোঝা যাবে।

নিজে করো ঃ-

একটা কাপড়ের টুকরো নাও। কোনো এক প্রান্ত থেকে খুব সাবধানে তন্তুগুলি আলাদা করার চেষ্টা করো। যদি অসুবিধা হয় তাহলে একটা পিনের সাহায্য নাও। এবার বলো তোমরা কী দেখতে পেলে? কারণ কী?

	কী দেখলে	কী বুঝলে
এবার কাপড় থেকে সুতো ছাড়ানো হল। তন্তুটিকে টেবিলের উপর রেখে নখের সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে ঘষা হল বেশ কয়েকবার।		

তাহলে তোমরা তো ভাল করেই দেখতে পেলে কাপড় তৈরী হয় বিভিন্ন সুতো দিয়ে। এখন দেখলে সুতোগুলির মধ্যে আরও সূক্ষ্ম তন্তু রয়েছে। এবার বলো তো ঐ সমস্ত তন্তুগুলি এলো কোথা থেকে? এগুলি কি প্রকৃতিতেই স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যায়?

নীচের তালিকাটি পূরণ করো —

সারণী-৩ ঃ-

তন্তু প্রকৃতি	উৎস	প্রকৃতিতে পাওয়া যায় কিনা
সুতি তন্তু		
রেশম তন্তু		
পশমের তন্তু		
টেরিকটন তন্তু		

জানো কি ঃ-

সুতি, রেশম, উল বা পশম প্রভৃতি তন্তু আমরা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পাই। তাই এদের আমরা **প্রাকৃতিক তন্তু** বলি। যে সমস্ত তন্তু রাসায়নিক বস্তু থেকে তৈরী হয় তাদের **কৃত্রিম তন্তু** বলে। যেমন পলিয়েস্টার, নাইলন, ইত্যাদি।

তাহলে আমরা দেখলাম তুলো (কার্পাস), রেশম কীটের গুটি থেকে বিভিন্ন তন্তু তৈরী হয়। এবার বলো দেখি এই সব তন্তুর আসল উৎস কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ? আর চলো তার সাথে জেনে নিই তারা কেমন দেখতে? তারা আর কীভাবে আমাদের উপকার করে?

প্রথমে আসল উৎসগুলি খুঁজে নিয়ে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

উপজাত বস্তু	কোথা থেকে পাওয়া যায়	উৎস
১. তুলো		
২. রেশম সুতো		

কার্পাস

তোমরা কি কখনো কার্পাস গাছ দেখেছো ? যদি দেখে থাকো তাহলে তোমাদের নিজের ভাষায় তার একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো, আর তার সাথে একটি ছবি আঁকার চেষ্টাও করো।

কার্পাসের চিত্র	উদ্ভিদের বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

কার্পাস গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম ঃ ***Gossypium herbacium***

গাছের বৈশিষ্ট্য

- দ্বিবীজপত্রী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।
- ১০-১২ ফুট লম্বা হয়।
- পাতা সরল প্রকৃতির।
- ফলের বীজত্বকের আঁশে অসংখ্য এককোষী রোম থাকে যেগুলি আসলে তুলো।
- ফল ফাটলে এই তুলো বাইরে আসে, এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

চাষ

- দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কার্পাস চাষ হয়।
- এছাড়া গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে প্রচুর কার্পাস চাষ হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার
তুলো	• তুলো থেকে সুতো তৈরী হয়। সেই সুতো উন্নতমানের সুতিবস্ত্র তৈরীতে ব্যবহার হয়। • লেপ, তোশক, কুশন, বালিশ তৈরীতে তুলো ব্যবহার করা হয়। • সুতো জামা কাপড় সেলাই-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। • তুলো পরিশোধন করে চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।
তুলোবীজ	• তুলোবীজ থেকে যে তেল নিষ্কাশন করা হয়, সেই তেল ভোজ্য তেল রূপে এবং সাবান, বনস্পতি প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। • তেল নিষ্কাশনের পর অবশিষ্ট বীজের খোসা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।
কান্ড	• তুলো গাছের কান্ড শুকনো করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিজে করো ঃ-

তোমরা কিছু পরিমাণ তুলো নাও। ভালো করে তুলোর বলটি খুলে ছড়িয়ে নাও। ঐ চ্যাপ্টা তুলোর যে কোন একটি প্রান্ত থেকে খুব অল্প পরিমাণ তুলো আলাদা করে হাতের তালুতে রাখো। এবার হালকা করে দুই পাশে টেনে নাও এবং শেষে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে তুলোটি পাকাতে থাকো। বেশ কিছুক্ষণ খুব ভালো করে পাকানোর পর কী দেখলে তা লেখো।

কী দেখলে	এ থেকে কী বুঝলে

এই পরীক্ষাটি করে তো তোমরা অতি সহজেই সুতো তৈরীর মূল নীতি বুঝতে পেরেছো।

এছাড়া যদি তোমরা অন্য কোনো ভাবে সহজেই সুতো তৈরী করতে পারো তার উপায়টি লেখো।

রেশম মথ

তোমরা তো জানো রেশম মথ রেশমগুটি তৈরী করে। কিন্তু কখনও কি তোমরা রেশমগুটি দেখেছো? যদি দেখে থাকো তাহলে নিজের ভাষায় রেশমগুটির একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো। রেশম সুতো তৈরীর জন্য এই গুটির কোন অংশ ব্যবহার করা হয় তা লেখো। তোমরা রেশমের যদি কোনো ব্যবহার জানো সেগুলি লেখো।

রেশমগুটির বিবরণ	রেশমগুটির চিত্র	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার
১. রেশমগুটি সৃষ্টিকারী পতঙ্গ			
২. কখন ও কীভাবে গুটি তৈরী করে			
৩. কোথায় গুটি থাকে			
৪. গুটি দেখতে কী রকম			

এই ছকটির অনুরূপ একটি ছক তোমাদের খাতায় বসিয়ে সেটি পূরণ করো।
তোমার বিবরণ এবার নীচের বিবরণের সাথে মিলিয়ে নাও।

রেশম মথের বিজ্ঞান সম্মত নাম ঃ *Bombyx mori*

১ ডিম
২ লার্ভা
৩ কোকুন
৪ রেশম গুটি
৫ রেশম তন্তু

রেশম মথ

- স্ত্রী রেশম মথ যে ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে রেশম কীট সৃষ্টি হয়।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার পর এরা নিজেদের একটি আবরণের মধ্যে ঢেকে নেয়।
- এর জন্য এরা প্রথমে পিউপা দশায় যায়। এই দশায় এদের মুখ থেকে এক ধরনের আঠালো সুতোর মতো তন্তু নিঃসৃত হয়।
- এই তন্তুগুলিই একটি ডিম্বাকৃতির কোকুন বা গুটি তৈরী করে।

রেশম গুটি

- এটি সোনালী বা হলুদাভ বর্ণের একটি ডিমের মতো আকৃতিযুক্ত খোলশ যেটি পিউপাকে আবৃত করে রাখে।

জানো কি ঃ-

রেশম উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রেশম মথের প্রতিপালনকে **সেরিকালচার** বলা হয়।

ব্যবহার্য অংশ	ব্যবহার
• রেশমগুটি	• রেশমগুটি থেকে রেশমতন্তু পাওয়া যায়। • উন্নতমানের তন্তু রেশমী বস্ত্র তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। • মাছ ধরার বড়শি বাঁধার জন্য রেশমের ডোর বানানো হয়। • সূক্ষ্ম চালুনি তৈরীর জন্য রেশমতন্তু ব্যবহার করা হয়।

প্রচুর পরিমাণ কোকুন বা গুটি একত্রিত করা হয়।
তারপর তাদের উচ্চতাপে ফোটানো হয় বা রোদে রাখা হয়।
এরপর একটি যন্ত্রের সাহায্যে গুটির গা থেকে ধীরে ধীরে রেশম তন্তু বের করা হয়।
সবশেষে এই সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে পাকিয়ে পাকিয়ে ব্যবহারযোগ্য রেশম তন্তু তৈরী করা হয়।

আমাদের কাজ ৩

	কী দেখলে	সিদ্ধান্ত
• প্রথমে তোমরা দুটি আলাদা রঙ-এর চার্ট পেপার নাও— ধরো লাল এবং সবুজ। • এবার প্রথমে লাল চার্ট পেপার থেকে স্কেলের সাহায্যে ১সেমি প্রস্থের বেশ কিছু লম্বা অংশ কেটে নাও এবং অনুরূপভাবে সবুজ চার্ট পেপার থেকেও সমপরিমাণ ১সেমি কেটে নাও। • লক্ষ্য রাখবে যে কোন একটি চার্ট পেপারের কোনো একটি প্রান্ত এমনভাবে রাখবে যাতে অংশগুলি একটি প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। • এবার অন্য রঙ-এর চার্ট পেপার থেকে কেটে নেওয়া অংশগুলি একের পর এক বুনতে শুরু করো।		

পাট গাছ

জামাকাপড় ছাড়াও তোমরা দেখেছো আমাদের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দড়ি জাতীয় তন্তুর ব্যবহার আছে। যেমন পাপোশ, বস্তা, চটের থলে, কাতাদড়ি ইত্যাদি। তোমরা কি জানো এজাতীয় বস্তুতে ব্যবহৃত দড়ির তন্তুগুলি কোথা থেকে আসে? দেখো তো এরকম কতগুলি বস্তুর ব্যবহার তোমরা দেখেছো যেখানে দড়ির ব্যবহার আছে। তাদের উৎস কী? এই উৎসগুলির মধ্যে কতগুলি আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই?

আমাদের কাজ ৪

দড়িজাত বস্তুসমুহ	তন্তুর উৎস	কোনটি উদ্ভিদজাত/উদ্ভিদজাত নয়	উদ্ভিদের নাম
পাপোশ			
চটের থলে			
________			
________			
________			

আমাদের কাজ ৫

তোমরা কয়েক টুকরো কাতা দড়ি এবং চটের দড়ি নাও। তারপর হাতের সাহায্যে দড়ির পাকগুলি খুলে নাও। তারপর তোমরা যেসব অপেক্ষাকৃত সরু সুতোর মতো অংশ পাবে, সেগুলিকে আবার হাতের সাহায্যে দুপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে টানতে থাকো। তাহলে তোমরা কী দেখতে পাবে বলো।

দড়ির প্রকৃতি	কী ধরনের তন্তু দিয়ে তৈরী
চটের দড়ি	
কাতা দড়ি	

তাহলে তোমরা দেখলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন ধরনের তন্তু পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা কি জানো ঐসব উদ্ভিদের কোন অংশ থেকে এজাতীয় তন্তুগুলি পাওয়া যায়? কোনো কোনো গাছের ফল থেকে, আবার কোনো কোনো গাছের কান্ড থেকে তন্তু পাওয়া যায়।

তোমরা কি বলতে পারো পাটের দড়ি ও কাতাদড়ি কোন উদ্ভিদের কোন অংশ থেকে পাওয়া যায়?

দড়ি	উদ্ভিদ	যে অংশ থেকে পাওয়া যায়
পাটের দড়ি	পাট গাছ	
কাতা দড়ি	নারকেল গাছ	

পাট-এর সুতো/তন্তু পাটগাছের কান্ড থেকে পাওয়া যায়। পাট গাছের কান্ডগুলিকে জলে রেখে দেওয়া হয়। তারপর কান্ডটি পচে গেলে, শক্ত কাঠের সাহায্যে আঘাত করে ছালের আঁশ বের করা হয়। এইগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে পাটের দড়ি বানানো হয়।

তোমরা কি কখনও পাট গাছ দেখেছো? পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পাওয়া যায় সেখানে পাটচাষ হয়। পাটগাছ-এর আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমরা যা জানো তা নিজের ভাষায় লেখো। পাটের দড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে যা জানো লেখো। তোমরা একটু ভেবে দেখলেই বলতে পারবে দৈনন্দিন জীবনে পাট-এর দড়ি এবং পাট গাছ কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়।

পাটগাছের বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

তোমার বিবরণ এবার নীচের বিবরণের সাথে মিলিয়ে নাও।

পাট গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ ***Corchorus capsularis**-তিতা পাট*
***Corchorus olitorius**-মিঠা পাট*
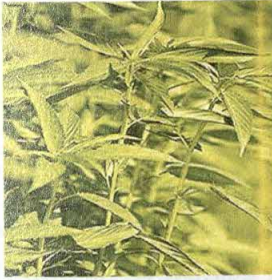
বৈশিষ্ট্য

- দ্বিবীজপত্রী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।
- ৫-৬ ফুট লম্বা হয়, সাধারণত শাখা বিহীন হয়।
- পাতা সরল প্রকৃতির।
- কান্ডের আঁশ থেকে গৌণ বাস্ট তন্তু বের করা হয়।
- এই তন্তুগুলি পাকিয়ে পাটের দড়ি তৈরী হয়।

চাষ

- নদীর কূলবর্তী অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমাণে পাটের চাষ হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার
পাটতন্তু	● পাটের তন্তুজাত দড়ি থেকে চট, থলে, বস্তা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী হয়। ● সূক্ষ্ম তন্তু থেকে কার্পেট, গালিচা, মশারি তৈরী করা হয়।
পাটের কান্ড	● পাটের শুকনো কান্ড বা পাটকাঠি জ্বালানী হিসাবে, পানগাছ চাষে, ঝিঙে চাষে, উচ্ছে চাষে মাচা বানাতে ব্যবহার করা হয়।
পাটের কচিপাতা ও নরম কান্ড	● পাটের কচি পাতা ও নরম কান্ড রান্না করে খাওয়া হয়।

নারকেল গাছ

তোমরা অনেকেই নারকেল গাছ দেখেছো। নারকেল গাছের ফল অর্থাৎ নারকেল খেয়েছো। তাহলে এবার চেষ্টা করে দেখো তো নারকেল গাছের সম্বন্ধে তোমরা কী জানো?

গাছের চিত্র	বিবরণ	ব্যবহারিক অংশ	ব্যবহার

তোমার বিবরণ এবার নিম্নলিখিত বিবরণের সাথে মিলিয়ে নাও।

নারকেল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Cocos nucifera*

বৈশিষ্ট্য

- একবীজপত্রী, শাখাবিহীন উদ্ভিদ।
- গাছটি ৩০-৪০ ফুট লম্বা হয়।
- পাতা পক্ষল যৌগিক পত্র।
- পাকা ফলগুলি নারকেল নামে পরিচিত।
- কাঁচা ফলকে ডাব বলে।
- নারকেল ছোবড়ার তন্তুগুলি পাকিয়ে কাতাদড়ি বানানো হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার
নারকেল ছোবড়া	● ছোবড়া থেকে নারকেল দড়ি, পাপোশ, গদি, জাজিম, গালিচা তৈরী হয়।
নারকেল পাতা	● পাতার শিরা থেকে ঝাঁটার কাঠি প্রস্তুত হয়। পাতা থেকে টুপি, মাদুর ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। শুকনো পাতা জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়।
নারকেল গাছের কান্ড	● শুকনো গুঁড়ি কড়িকাঠ, খুঁটি, পুকুরের ঘাট তৈরীর কাজে ও বাড়ী ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়।
নারকেল	● কচি ডাব-এর জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
	● এটি রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
	● নারকেল শাঁস আসলে সস্য। শুকনো শাঁস পেষাই করে তেল বের করা হয়।
	● এই তেল ভোজ্য তেল হিসাবে খাওয়া হয়।
	● এই তেল মাথায় মাখার জন্য, সাবান তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।

আমরা যা শিখলাম

- জামা কাপড় তৈরীর জন্য যেসব তন্তু ব্যবহার করা হয় তা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম -এই দুই ধরনের হয়।
- প্রাকৃতিক তন্তুগুলি — প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়।
- রেশমমথের তৈরী রেশমগুটি থেকে রেশমতন্তু পাওয়া যায়।
- কার্পাস গাছের ফল থেকে তুলো পাওয়া যায় আর তুলো পাকিয়ে cotton বা সুতির তন্তু তৈরী হয়।
- তুলো বীজের বহিঃত্বকের আঁশ-এ এককোষী রোম থাকে। আর সেগুলিই আসলে জমা হয়ে তুলো তৈরী হয়।
- তুলো চরকার সাহায্যে পাকিয়ে সুতো বানানো হয়।
- রেশম মথের ডিম থেকে অসংখ্য লার্ভা তৈরী হয়। ঐ লার্ভা বা শুককীট আর একটু বড় হয়ে পিউপা বা মুককীট-এ পরিণত হয়।
- এই মুককীটগুলি নিজের মুখের আঠালো রস দিয়ে একটি আবরণ তৈরী করে, যাকে আমরা রেশমগুটি বা কোকুন বলি।
- এই গুটি থেকেই রেশম সুতো পাওয়া যায়।
- পাটের সুতো বা তন্তু পাটগাছের কান্ড থেকে পাওয়া যায়।
- নারকেল গাছের ফলের বহিঃত্বকের তন্তুগুলিকে ছোবড়া বলি।
- এই ছোবড়ার তন্তুগুলি পাকিয়ে কাতা দড়ি বানানো হয়। এবং সেই দড়ি ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। যেমন, কার্পেট, পাপোশ, ইত্যাদি।

ভেষজ উদ্ভিদ

তোমরা তো চারপাশে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা দেখেছো। বলতে পারো তার মধ্যে কোন কোন গাছপালা আমাদের রোগ বা ব্যাধি সারানোর কাজে লাগে? তোমরা কি কখনও বাড়ির বয়স্ক লোকজনকে কোন রোগ সারানোর জন্য গাছপালার ব্যবহার করতে দেখেছো?

এবার তোমরা নীচের ছকটি পূরণ করো।

সারণী-১ ঃ-

গাছের নাম	কী রোগে কাজে লাগে
তুলসী	সর্দি, কাশিতে কাজে লাগে

জেনে রাখো ঃ- যে সব উদ্ভিদ থেকে ওষুধ তৈরী হয় তাদের ভেষজ উদ্ভিদ বা বনৌষধি (Medicinal Plant) বলে।

তুলসী

তোমরা কি কখনও তুলসীগাছ দেখেছো? যদি দেখে থাকো তাহলে নিজের ভাষায় ঐ গাছটির বিবরণ দাও। বলতে পারো কি তুলসী গাছের কোন কোন অংশ রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়?

সারণী-২ ঃ-

তুলসীগাছের বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

তোমাদের বিবরণের সাথে নীচের বিবরণ মিলিয়ে নাও।

সাধারণ পরিচিতি

- তুলসীগাছ বর্ষজীবী, বীরুৎ জাতীয়, সপুষ্পক, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।
- তুলসীগাছের গা থেকে ঝাঁজালো গন্ধ বের হয়।
- কান্ডের শাখা প্রশাখার আগায় একটা লম্বা মঞ্জরীদন্ডের ওপর একসঙ্গে ছোট ছোট ফুল গুচ্ছভাবে জন্মায়।
- গাছের সব অংশই ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ	ব্যবহার
পাতা	● পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সর্দি কাশির ওষুধ রূপে ব্যবহার করা হয়। ● বুকে জমা সর্দি তরল করতে পাতার রস ব্যবহার করা হয়। ● পেটের গোলযোগে পাতার রস ব্যবহার করা হয়। ● পাতার রস কাঁচা হলুদের সাথে মিশিয়ে আখের গুড়-এর সাথে খাওয়ালে বহুমূত্র রোগ সারে। ● পাতার রস আমবাতে ব্যবহার করা হয় ও এটি একটি কৃমিনাশক।

নিম

তোমরা কি কখনও নিমগাছ দেখেছো? যদি দেখে থাকো তাহলে নিমগাছ-এর একটি ছোট বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো। বলতে পারো এই গাছের কোন অংশগুলি রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়? কোন কোন রোগ নিরাময় হয়?

তোমাদের জানা বিষয় থেকে নিচের ছকটি পূরণ করো ঃ-

সারণী-৩ ঃ-

নিমগাছের বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

তোমাদের বিবরণের সাথে নীচের বিবরণ মিলিয়ে দেখো।

নিমগাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Azadirachta indica*

নিম

সাধারণ পরিচিতি

- নিমগাছ গুঁড়িবিশিষ্ট, বৃক্ষজাতীয়, বহুবর্ষজীবি, সপুষ্পক ও দ্বিবীজপত্রী।
- নিমগাছের কান্ড বেশ মজবুত ও কাষ্ঠল।
- পাতাগুলি যৌগিকপত্র ও কিনারা খাঁজকাটা।
- ফুলগুলি ছোট ও সাদা, সেগুলি পুষ্পমঞ্জরীতে সাজানো থাকে।
- ফলগুলি আঙুরের মতো এবং সবুজাভ।
- গাছের পাতা, ফুল, ফল, কান্ডের ছালে ঔষধি গুণ আছে।

ব্যবহার্য্য অংশ	ভেষজ ব্যবহার
পাতা	• পাতার রস কৃমিনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। • পাতার তেল চুলকানি, খোসপাঁচড়া সারাতে কাজে লাগে। • নিমপাতা বেটে গায়ে মাখলে তা অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসাবে কাজ করে। • নিমপাতা ও গোলমরিচ একসঙ্গে খালি পেটে খেলে রক্ত-শর্করা নিয়ন্ত্রিত থাকে।
ছাল	• ছাল ভেজানো জল ক্ষতস্থান পুরণে ব্যবহার করা হয়। • এই জল অজীর্ণ দূর করে।
ফুল	• নিম ফুল ভাজা রাতকানা রোগ সারাতে কাজে লাগে।
বীজ	• বীজের তেল মুখের ঘা সারাতে কাজে লাগে।

বাসক

তোমরা তো বাসক গাছ অনেকেই দেখেছো। এবার বাসকের একটি ছোট বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো। বলো তো এই গাছের কোন কোন অংশ রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সারণী-৪ ঃ-

বাসকগাছের বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার/ভেষজ গুণ

তোমাদের বিবরণের সাথে নীচের বিবরণ মিলিয়ে দেখো।

বাসকগাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Adhatoda vasica*

বাসক	
	সাধারণ পরিচিতি • বাসক গাছ সপুষ্পক, দ্বিবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবি, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। • পাতাগুলি সরল প্রকৃতির, কিনারা মসৃণ। • পাতাগুলি স্বাদে তেতো প্রকৃতির। • সাদা রঙের ফুলগুলি একটি সাধারণ মঞ্জরীদন্ডের উপর বিন্যস্ত থাকে। • সাধারণত পাতা ভেষজ অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারযোগ্য অংশ	ব্যবহার
পাতা	• পাতার রস ব্রঙ্কাইটিসের নিরাময়ে সাহায্য করে। • পাতার রস হৃদরোগের নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। • পাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল খেলে সর্দি-কাশির উপশম হয়।

কালমেঘ

তোমরা তো দৈনন্দিন জীবনে কালমেঘ গাছ দেখেছো ও তার ব্যবহার দেখেছো। এখন তোমরা কালমেঘের একটি ছোট বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো। এই গাছের কোন অংশ কী রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা নীচের ছকটিতে লেখো।

বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

তোমরা নিজের বিবরণটি নীচের বিবরণের সাথে মিলিয়ে দেখো।

কালমেঘের বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Andrographis paniculata*

কালমেঘ	
	সাধারণ পরিচিতি ● কালমেঘ চিরসবুজ, বীরুৎশ্রেণির, সপুষ্পক, বর্ষজীবি উদ্ভিদ। ● পাতাগুলি ছোট, গাঢ় কালচে সবুজ বর্ণের। ● সাদা রঙের ফুল লম্বা একটি দন্ডের উপর থাকে। ফুলের খোলা মুখের ভিতরের গা বেগুনী দাগযুক্ত।

ব্যবহারযোগ্য অংশ	ব্যবহার
পাতা ও কান্ড	● পেটের ব্যথা নিরাময়ে পাতার রস ব্যবহার করা হয়। ● পাতার রস টাইফয়েড রোগের নিরাময়ে ব্যবহার কারা হয়। ● জনডিস রোগের চিকিৎসায় কালমেঘের পাতার রস ব্যবহার করা হয়। ● ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে কালমেঘের রস ব্যবহার কারা হয়। ● যকৃতের বিভিন্ন রোগে কালমেঘের রস খুব উপকারী।

থানকুনি

তোমরা কি কখনও থানকুনি গাছ নিজে দেখেছো? যদি দেখে থাকো তাহলে এর একটি ছোট্ট বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো। এই গাছের কোন অংশগুলি রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়, তা জানো কী? যদি জানো তাহলে নীচের ছকে লেখার চেষ্টা করো।

বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

এবার তোমাদের বিবরণটি নীচের বিবরণের সাথে মিলিয়ে নাও।

থানকুনির বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Centella asiatica*

সাধারণ পরিচিতি

- থানকুনি একটি বীরুৎ শ্রেণির, সপুষ্পক, বর্ষজীবি, লতানো উদ্ভিদ।
- এটি সাধারণত মাটিতে লতিয়ে চলে। কান্ডের পর্বে অস্থানিক মূলও থাকে।
- পাতা লম্বা বৃন্তযুক্ত। পাতাগুলি গোলাকার এবং কিনারা খাঁজকাটা।

ব্যবহারযোগ্য অংশ	ব্যবহার
পাতা	• পাতার রস আলসার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। • পাতার রস স্নায়ু উত্তেজনা কমাতে ব্যবহার করা হয়। • পাতার রস ভাইরাস ঘটিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। • পাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল খেলে মানসিক রোগ নিরাময় হয় এবং এটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। • পাতা বেটে সেই মন্ড ব্যথার উপশমে ব্যবহার করা হয়।

সর্পগন্ধা

তোমরা কী কখনও সর্পগন্ধা গাছ দেখেছো? যদি দেখে থাকো তার একটি ছোট্ট একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করো। সর্পগন্ধার কোন অংশ রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয় তা লেখার চেষ্টা করো।

বিবরণ	ব্যবহার্য্য অংশ	ব্যবহার

এবার তোমাদের বিবরণটি নীচের বিবরণের সাথে মিলিয়ে নাও।

সর্পগন্ধার বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Rauwolfia serpentina*

সাধারণ পরিচিতি

- সর্পগন্ধা গুল্মজাতীয়, দ্বিবীজপত্রী, সপুষ্পক উদ্ভিদ।
- পাতাগুলি লম্বাটে, কিনারা মসৃণ।
- কান্ডের আগায় পুষ্পমঞ্জরিতে অনেক ফুল উৎপন্ন হয়।
- ফুলের রঙ গোলাপী বর্ণের।
- ফলগুলি পাকলে লাল বর্ণ ধারণ করে।

ব্যবহারযোগ্য অংশ	ব্যবহার
মূল	● মূলের রস উচ্চরক্তচাপ কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ● অনিদ্রা ও স্নায়ুউত্তেজনা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ● মানসিক বিকার ও উন্মাদনা কমানোর জন্য মূলের রস ব্যবহার করা হয়। ● আমাশয় ও জ্বর ইত্যাদি উপশমের জন্য মূলের রস ব্যবহৃত হয়।

আমরা যা শিখলাম

- চারপাশের যে সকল গাছপালা থেকে আমাদের রোগ বা ব্যাধি সারানোর ওষুধ তৈরী হয় — সেগুলিই ভেষজ উদ্ভিদ।
- তুলসীর পাতা একাধিক রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- নিমগাছের পাতা, ফুল, ফল, কান্ড সব অংশেরই ঔষধি গুণ আছে।
- ব্রঙ্কাইটিস, সর্দিকাশিতে বাসক গাছের পাতার রস খেলে রোগ সারে।
- পেটের ব্যথা এবং যকৃতের বিভিন্ন রোগের উপশমে কালমেঘ খুব উপকারী।
- থানকুনি পাতার রস পেটের ব্যথা এবং স্নায়ু ঘটিত অসুখে উপকারী।
- সর্পগন্ধা গাছের মূলের রস অনিদ্রা, স্নায়ু উত্তেজনা আর উচ্চ রক্তচাপ কমায়।

বাসস্থান নির্মাণে উদ্ভিদ অংশের ব্যবহার

তোমরা অনেকেই ইঁট-পাথরের তৈরী বাড়ি-ঘর ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে মাটির ঘর, কুঁড়েঘর দেখেছো। তাহলে তোমরা কি বলতে পারো গ্রামাঞ্চলের ঘর-বাড়ি বানানোর জন্য কোন ধরনের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ অংশ ব্যবহার করা হয়?

তোমাদের সাধ্যমত নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

গাছের নাম	অংশ	কী রোগে কাজে লাগে
ধান গাছ	খড়/শুকনো বিটপ	ঘর-বাড়ির ছাউনি নির্মাণে
বাঁশ গাছ		
নারকেল		

খড়, বাঁশ, নারকেল পাতা, গোলপাতা, নারকেল কাঠ, তালগাছের কাঠ প্রভৃতি বাসস্থান নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

তোমাদের তালিকাটির সাথে নীচের বিবরণটি এবার মিলিয়ে নাও —

	উদ্ভিদ অংশ	ব্যবহার
	কান্ড —	
	১) ধানগাছের কান্ড বা খড়	● ঘর-বাড়ির চাল ছাইতে ব্যবহার করা হয়।
	২) বাঁশগাছের কান্ড	● ঘর-বাড়ির চালের কাঠামো তৈরীতে, দরজা, জানালা, দরমা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।
	৩) নারকেল এবং তালগাছের কান্ড	● ঘর-বাড়ির কাঠামো, দরজা, জানালা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।
	পাতা —	
	১) নারকেল পাতা ২) গোলপাতা ৩) তালপাতা ৪) খেজুরপাতা	● কুঁড়ে ঘর বা মাটির ঘরের চাল ছাইতে, চারপাশ ঘিরতে বিভিন্ন ধরনের পাতা ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

১। 'ক' স্তম্ভের গাছগুলোর কোন অংশের তন্তু থেকে সুতো বা দড়ি তৈরী করা হয় তা 'খ' স্তম্ভে লেখো।

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
পাট	
কার্পাস	
নারকেল	

২। নিচের ছবিটা কিসের ভালো করে দেখে লেখো। এর থেকে কী পাওয়া যাবে?

৩। রেশমের চাদর, পশমের সোয়েটার, টেরীকটের সার্ট, সুতির শাড়ি, নাইলনের জামা, চটের বাজারের থলি, দড়ির পাপোশ — এগুলি কোনটি প্রাকৃতিক তন্তু এবং কোনটি কৃত্রিম তন্তু থেকে তৈরী, তা নিচের নির্দ্দিষ্ট ঘরে লেখো।

প্রাকৃতিক তন্তু	কৃত্রিম তন্তু

৪। নিচের সূত্রগুলোর মধ্যে কিছু ওষধি গাছের নাম বা রোগ উপশমের কথা বলা আছে, একাধিক বার সূত্রগুলো পড় এবং শব্দছকটা নির্দেশ অনুসারে পূরণ করো।

সূত্র ঃ- পাশাপাশি

১) যদি এই রোগেতে কষ্ট পাও
বাসক পাতা ফুটিয়ে খাও। (দু অক্ষর)

২) ঝাঁজালো গন্ধ, বর্ষজীবী, বিরুৎ জাতীয়,
ঔষধি গুণে অতুলনীয়। (তিন অক্ষর)

ওপর নিচ

১) অতি তেতো পাতার রস
যকৃতের রোগ করে বশ। (চার অক্ষর)

৫। নিমগাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার নির্দিষ্ট ঘরে লেখো।

কান্ড
ব্যবহার

পাতা
ব্যবহার

বাকল
ব্যবহার

নিম

ফল
ব্যবহার

মূল
ব্যবহার

ফুল
ব্যবহার
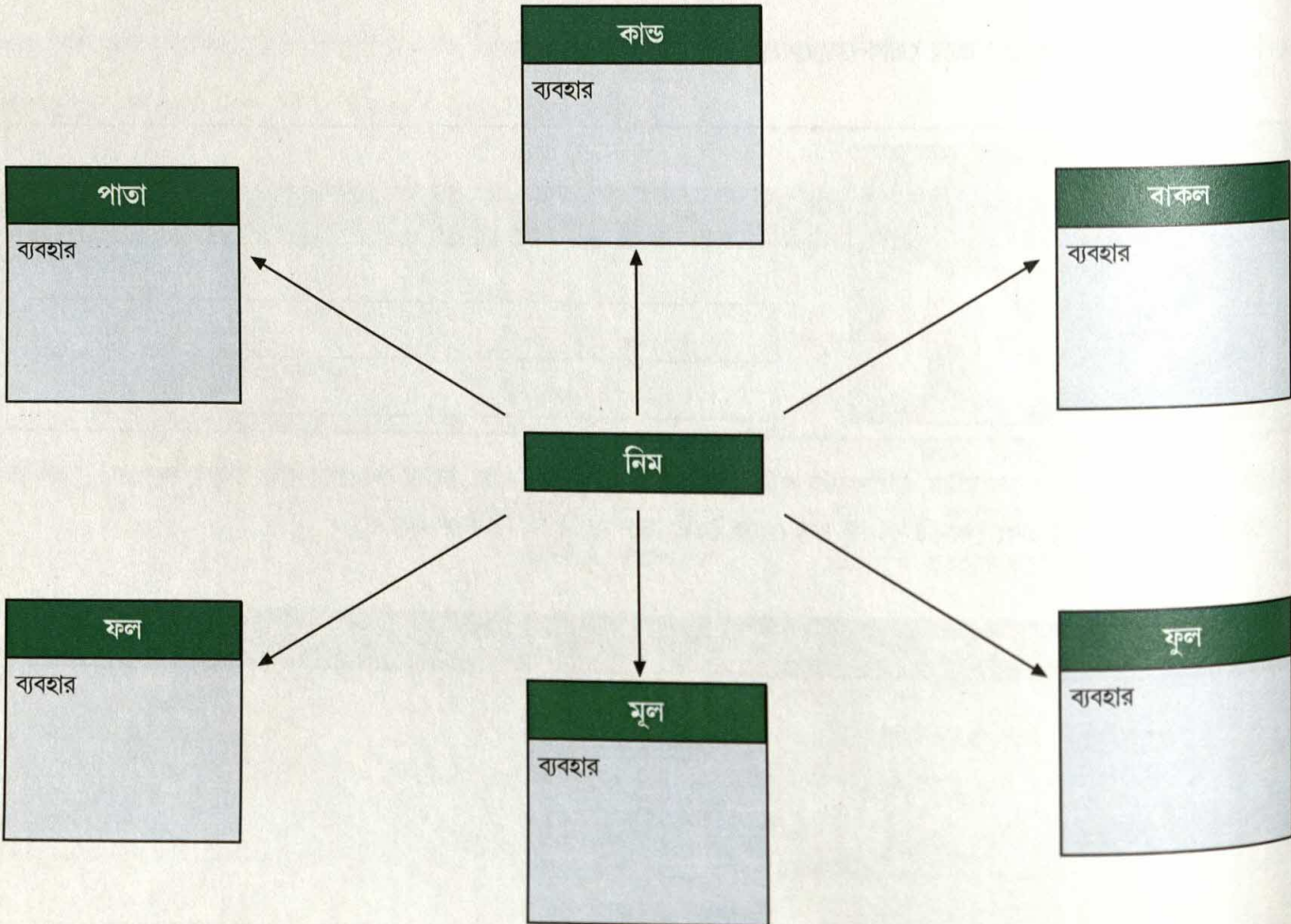
৬। চালের বস্তা তৈরীর সুতলি আর প্যান্ডেল করার সময় বাঁশ বাঁধার দড়ি কোন কোন গাছের কোন কোন অংশ থেকে তৈরী হয়?

৭। 'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করে লেখো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
নিম	মূলের রস উচ্চরক্ত চাপ কমাতে ব্যবহার করা হয়।
সর্পগন্ধা	মাটিতে লতিয়ে চলে, পাতা গোলাকার এবং কিনারা খাঁজকাটা।
তুলসী	পাতা বাটা অ্যান্টিসেপ্টিক, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
থানকুনি	পাতার রস সর্দি কাশির জন্য মধুর সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।
	ফল ফাটলে তুলো পাওয়া যায়।

৮। তোমার জানা একটি প্রাকৃতিক তন্তুর নাম লেখো। কোথা থেকে সেই তন্তু কীভাবে তৈরী করা হয় এবং তার থেকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য কী তৈরী হয়?

সামাজিক পতঙ্গ—মৌমাছি

আমাদের চারপাশে মানুষ ছাড়াও আরো কিছু প্রতিবেশী প্রাণীরা আছে। ঘরের মধ্যে টিকটিকি, আরশোলা, পিঁপড়ে— এদের সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। এই সমস্ত প্রাণীগুলির বেঁচে থাকার পদ্ধতিও আলাদা আলাদা। বাড়ির ভেতরে বা আশেপাশে বা তোমার স্কুলের বাগানে দেখা প্রাণীগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং নীচের তালিকাটি পূর্ণ করো।

প্রাণীর নাম	একা একা থাকে	দল বেঁধে থাকে
১. পিঁপড়ে	—	✓
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

তোমরা যে প্রাণীগুলি উল্লেখ করে থাকতে পারো তাদের মধ্যে কুকুর, বিড়াল, টিকটিকি, বোলতা, প্রজাপতি, মৌমাছি ইত্যাদির কথা আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি পতঙ্গ দলবদ্ধভাবে বাসা তৈরী করে থাকে। মৌমাছিরা তাদের বাসাতে (মৌচাকে) দলবদ্ধভাবে থাকে। সম্ভব হলে মৌচাক আছে এরকম একটি বাগানে গিয়ে মৌচাক ও মৌমাছিদের পর্যবেক্ষণ করে তালিকাটি পূর্ণ করো।

১. মৌমাছিরা গাছের কোন অংশে বসছে ?	
২. চাকের সব মৌমাছি কি একই রকম ?	
৩. সব মৌমাছি কি উড়ে - ঘুরে বেড়াচ্ছে ?	
৪. মৌমাছিরা কেন গাছে গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে তোমাদের মনে হয়?	
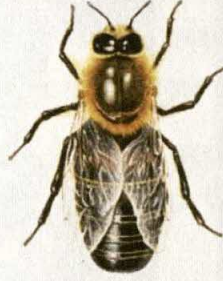
মৌচাক রানি মৌমাছি শ্রমিক মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি

তোমরা যে তথ্যগুলিকে জোগাড় করলে সেগুলি থেকে বোঝা গেল মৌমাছিরা দলবদ্ধভাবে বাসা বেঁধে থাকলেও সবাই একই ধরনের কাজ করে না। বেশীরভাগ মৌমাছি গাছের ফুলে ফুলে ওদের খাবার - মকরন্দ ও ফুলের রেণু সংগ্রহ করে। এই মৌমাছিরাই মৌচাকে লার্ভার (পলুর) প্রতিপালন, রানির পরিচর্যার কাজ এবং মৌচাককে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে, এরা সকলেই **শ্রমিক মৌমাছি**। এরা কিন্তু সকলেই **স্ত্রীলিঙ্গের প্রাণী**। ওদের রাজ্যে অবশ্য একজনই রানি, যে আয়তনে অন্যদের থেকে বড়। যার কাজ হল শুধু ডিম পেড়ে যাওয়া, যাতে মৌমাছির বংশধারা এগিয়ে যেতে পারে। কোন একজন রাজা না থাকলেও বেশ কিছু পুরুষ মৌমাছি থাকে, এরা শ্রমিকের থেকে আয়তনে বড় কিন্তু রানির থেকে ছোট, এদের চোখগুলো অন্যদের থেকে অনেকটা বড়। এরা সন্তান উৎপাদনে রানিকে সাহায্য করে — এদের **ড্রোণও** বলা হয়। সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনে রানি মৌমাছি বহু পুরুষ মৌমাছির (ড্রোণ) সংগে যে নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতে উড়ে বেড়ায় তা হল বৈবাহিক উড্ডয়ণ। জেনে রাখ রানি মৌমাছির দেহ থেকে নিঃসৃত হয় এক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ (ফেরোমোন) যার আকর্ষণেই দলের সকল সদস্যরা মৌচাকে দল বেঁধে থাকে এবং নিজেদের গোষ্ঠীর নিজস্বতা বজায় রাখে।
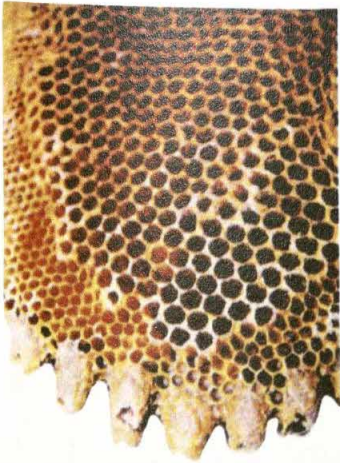
মৌচাকে বিভিন্ন ধরনের প্রকোষ্ঠ

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মৌচাকে প্রত্যেক মৌমাছির আলাদা আলাদা কাজ থাকে। শ্রমিকেরা প্রায় সব কাজই করে। ফুলের রেণু সংগ্রহ করে পায়ের থলিতে রেখে দেয়। ফুলের রস বা মকরন্দ সংগ্রহ করে মধু তৈরী করে। এদের শরীরে এক রকম বিশেষ গ্রন্থি থাকে যার থেকে মোম তৈরি হয়। এই মোমকে তারা বাসা বানানোর কাজে ব্যবহার কারে। এরা শুধু ডিম পাড়তে পারে না। কেবলমাত্র রানি মৌমাছি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। লার্ভাদের পরিচর্যায় পুরুষ মৌমাছিরা শ্রমিকদের সাহায্য করে। সকল মৌমাছিদের জীবনচক্র ডিম — লার্ভা — পিউপা — পূর্ণাঙ্গ এই চারটি দশায় সম্পূর্ণ হয়।

মকরন্দ ও রেণু সংগ্রহরত মৌমাছি

রানির ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ হতে ১৬দিন সময় লাগে। পুরুষ ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ হতে লাগে ২১দিন। যে লার্ভাগুলি কুইনকাবে থাকে এবং যাদের কেবলমাত্র বেশী পরিমাণ প্রোটিনযুক্ত খাবার (যাকে রয়াল জেলী বলে) দেওয়া হয় সেগুলি থেকে রানি মৌমাছি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পুরুষ এবং শ্রমিকের লার্ভাগুলিকে প্রথম তিনদিন উচ্চ

মৌচাকে কর্মব্যস্ত মৌমাছি

প্রোটিন যুক্ত খাবার দিলেও পরবর্তী দিনগুলিতে সাধারণ মধু ও পরাগরেণু খাওয়ানো হয়। মৌমাছিরা যেমন দলবদ্ধভাবে বাস করে তেমনি সকলে দলের নিয়ম মেনে চলে। সকল কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং কয়েক প্রজন্ম একসাথে বসবাস করে ও সন্তানদের প্রতিপালন করে, তাই এদের আদর্শ সামাজিক পতঙ্গ বলে।

একটি মৌচাকে সাধারণতঃ ৫-১০ হাজার মৌমাছি থাকে। রানি সাধারণত ২-৩ বছর বাঁচলেও শ্রমিকেরা সাধারণত ৬-১২ সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচতে পারে। পুরুষদের অবশ্য প্রয়োজন ছাড়া বাঁচিয়ে রাখা হয় না। রানি ও শ্রমিকের আত্মরক্ষার জন্য হুল থাকলেও পুরুষের হুল থাকে না।

বাগানে আগেই মৌচাক দেখেছো। সম্ভব হলে পরিত্যক্ত মৌচাক অথবা সাধারণ মৌচাকের একটি অংশ শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সংগ্রহ করে, নীচের বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ করো।

১. মৌচাক কী ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি?	
২. মৌচাকের প্রকোষ্ঠ (কুঠুরি) গুলির আকৃতি কী ধরনের?	
৩. মৌচাকে মধু কোথায় সঞ্চিত থাকে?	
৪. মৌচাকের মধ্যে পুরুষ এবং শ্রমিকের কুঠুরিগুলি কেমন?	
৫. যে প্রকোষ্ঠ থেকে রানি মৌমাছির জন্ম হয়, তার বিশেষত্ব কী?	

শ্রমিক মৌমাছিদের দেহ থেকে বেরোনো মোম জাতীয় একপ্রকার পদার্থ দিয়ে মৌচাক তৈরী হয়। মৌচাকের সকল প্রকোষ্ঠগুলি আকৃতিতে ষড়ভূজাকার। মৌচাকের নিচের দিকের লম্বা প্রকোষ্ঠগুলিতে লার্ভা থেকে রানি মৌমাছি সৃষ্টি হয়, এগুলি হল কুইন কাব্। মৌচাকের

উপরের দিকের প্রকোষ্ঠগুলিতে শ্রমিক মৌমাছি মধু ও ফুলের রেণু ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে সঞ্চয় করে রাখে। মধুতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় শর্করা যা স্বাদে মিষ্টি এবং প্রোটিন থাকে, তাই মধু কেবল মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যই নয়, বরং নানা রোগের প্রতিষেধক। মধুর এই ঔষধিগুণের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে মধুর ব্যবহারের প্রচলন আছে।

মৌমাছিরা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষের বড় উপকার করে। ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহের সময় পরাগমিলন ঘটায়, ফলে উদ্ভিদের যেমন বংশ বিস্তার ঘটে তেমনি মানুষের খাদ্যশস্য ও ফলের যোগান নিশ্চিত হয়। তাই মৌমাছি মানুষের উপকারী ও বান্ধব প্রাণী।
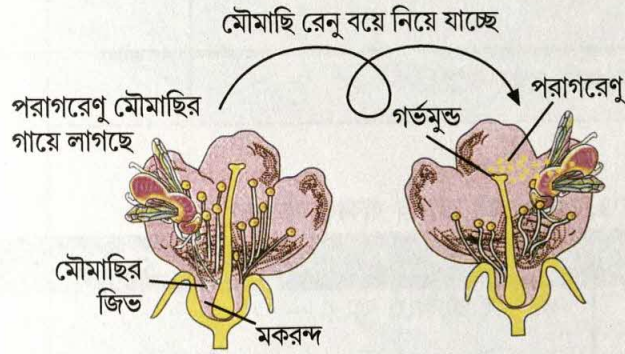
পৃথিবীতে প্রায় ২০,০০০ মৌমাছির প্রজাতি আছে, যাদের মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি সামাজিক পতঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত, বর্তমানে ভারতে পাওয়া যায় এমন তিনটি মৌমাছি হল —

- *Apis mellifera*
- *Apis florea*
- *Apis dorsata*

আমরা যা শিখলাম

- কিছু প্রাণী এককভাবে, কিছু প্রাণী দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।
- যে প্রাণীগোষ্ঠির সদস্যদের মধ্যে কাজের নির্দিষ্ট ভাগ আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ কাজ করে, সেই ধরনের প্রাণীগোষ্ঠীকে সামাজিক প্রাণী বলে।
- মৌমাছি একটি সামাজিক পতঙ্গ। মৌচাকে মৌমাছির দলে একটি রানি মৌমাছি, স্বল্প সংখ্যক পুরুষ ও অসংখ্য শ্রমিক মৌমাছি থাকে।
- সকল মৌমাছির জীবন ডিম-লার্ভা-পিউপা-পূর্ণাঙ্গ, — এই পর্যায়গুলি নিয়ে সম্পন্ন হয়।
- মৌচাক শ্রমিক মৌমাছির দেহ নিঃসৃত মোমজাতীয় বিশেষ ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রকোষ্ঠগুলি ষড়ভূজাকার।
- শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকে মধু জমা রাখে, এই মধু মানুষেরও প্রয়োজনীয় খাদ্য। মৌমাছি পরাগমিলন ঘটায় বলে আমাদের সারাবছর খাদ্যশস্য-ফলের যোগান থাকে। মৌমাছি তাই উপকারী প্রাণী।

নিজে করে দেখো

ক)

কাজ	যে মৌমাছি করে
১. রানিমৌমাছির সঙ্গে বৈবাহিক উড্ডয়নে অংশ গ্রহণ করে।	
২. দেহ থেকে ফেরোমন নিঃসৃত করে গোষ্ঠির সদস্যদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।	
৩. মৌচাককে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে।	

খ) বামদিকের স্তম্ভের বক্তব্যটি পড়ে, ডানদিকের স্তম্ভের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো।

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
যে লার্ভাটি থেকে পূর্ণাঙ্গ রানি মৌমাছি তৈরি হবে সেই লার্ভাটি	ক. যে প্রকোষ্ঠে থাকে — খ. এই প্রকোষ্ঠগুলি চাকের যে দিকে থাকে — গ. এর খাদ্য হল — ঘ. যাদের পরিচর্যা পায় — ঙ। এর লিঙ্গ হল —

গ) বামদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলাও।

বামদিক	ডানদিক
১. যারা স্ত্রী লিঙ্গের হওয়া সত্ত্বেও ডিম পাড়ে না	রানি
২. যাদের মৌচাকে অন্যান্য কাজে না লাগানো গেলে মেরে ফেলা হয়	শ্রমিক
৩. মৌমাছি গোষ্ঠিতে সবচেয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকা জরুরী	পুরুষ

ঘ) মৌচাকের প্রকোষ্ঠগুলি ষড়ভুজাকার — সম্ভাব্য সুবিধাগুলি কী বলে তোমার মনে হয়?

ঙ) নিচের ছবি দেখে শ্রমিক, পুরুষ ও রানি মৌমাছি চিহ্নিত করো এবং যে বৈশিষ্টের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হল, তা লেখো।

অনুশীলনী

১) নিচের বিকল্প উত্তরগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো।

ক. নীচের কোন পতঙ্গটি দলবদ্ধ জীবন-যাপন করে না —

i) পিঁপড়ে

ii) ফড়িং

iii) মৌমাছি

iv) বোলতা

খ. দুজোড়া ডানা, তিনজোড়া পা ও একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকায় মৌমাছি হ'ল —

i) পক্ষি

ii) সরীসৃপ

iii) পতঙ্গ

iv) মৎস্য শ্রেণির প্রাণী

২) শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক. শ্রমিক মৌমাছিরা যে লার্ভাকে ——————— খাওয়ায় তাদের থেকে রানি মৌমাছি সৃষ্টি হয়।

খ. যে স্ত্রী মৌমাছি ডিম পাড়তে পারে না তা হ'ল ————————— ।

গ) বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভ মেলাও —

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
i) পুরুষ মৌমাছি	i) মৌমাছির বাসা (মৌচাক)
ii) শ্রমিক মৌমাছি	ii) ফেরোমোন
iii) মৌ-মোম	iii) ড্রোণ
iv) রানি মৌমাছি	iv) মৌচাক রক্ষা করে

ঘ) পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও।

i) কলোনীতে পুরুষ মৌমাছির কাজ কী?

ii) কুইন-কাব কী?

iii) রানি ও পুরুষের বহিরাকৃতিগত দুটি পার্থক্য লেখো।

ঙ) i) মৌমাছিকে সামাজিক পতঙ্গ বলে — যুক্তি দাও।

ii) মৌচাকের প্রকোষ্ঠগুলি গোল হ'লে কী সুবিধা বা অসুবিধা হ'ত, উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

বায়ু

বায়ুর উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা

বায়ু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বায়ুর প্রয়োজন। বায়ুকে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তাহলে বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কীভাবে ধারণা করা যায় ?

অসহ্য গরমে শ্রেণি কক্ষের পাখাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকলে তোমাদের অস্বস্তি বোধ হয়। আবার পাখা চালিয়ে দিলে বেশ আরাম বোধ হয়। কখনো কখনো দেখতে পাও গাছের পাতাগুলো দুলছে।

- পাখা চলার ফলে বায়ুপ্রবাহ হল, তুমি আরাম বোধ করলে।
- বায়ুপ্রবাহের জন্যই গাছের পাতাগুলো দুলছে।

আমাদের কাজ ১

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
একটি বালতিতে জল নিয়ে তার মধ্যে একটি কাচের বোতলের খোলা মুখ সোজাসুজি ডোবাও। এবার বোতলটিকে ধীরে ধীরে একটু কাত করো।		
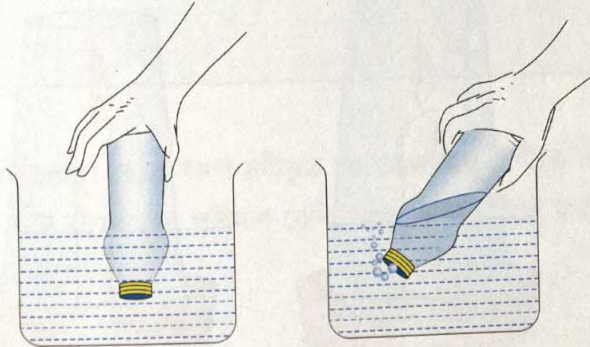
- বায়ু কিছু জায়গা দখল করে। কাত করে বোতলটিকে প্রবেশ করালে বুদবুদ আকারে বায়ু বেরিয়ে যায় এবং সেই স্থানে জল প্রবেশ করে।
- তাহলে তোমরা জানতে পারলে বায়ু কিছু জায়গা দখল করে।

বায়ুর উপাদান

বায়ুর মধ্যে অনেকগুলো গ্যাসীয় পদার্থ মিশে আছে। এই গ্যাসীয় পদার্থগুলির কোনোটিরই রং নেই। বায়ুকে দেখা না গেলেও নাক-মুখ বন্ধ করলে যে দমবন্ধ অবস্থা হয় তাতেই বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আবার অক্সিজেন গ্যাস প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। তাহলে প্রাথমিক ধারণা হল বায়ুতে অক্সিজেন আছে।

অক্সিজেনের উপস্থিতির পরীক্ষা

আমাদের কাজ ২

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
দুটি অগভীর প্লাস্টিকের বাটিতে কিছু পরিমাণ জল রাখো। পাত্র দুটির প্রত্যেকটির মাঝখানে একটি করে সমান মাপের মোমবাতি দাঁড় করিয়ে রাখো। এবার দুটি মোমবাতিকে একসাথে জ্বালিয়ে ভিন্ন মাপের দুটি কাচের গ্লাস উপুড় করে ঢেকে দাও।		
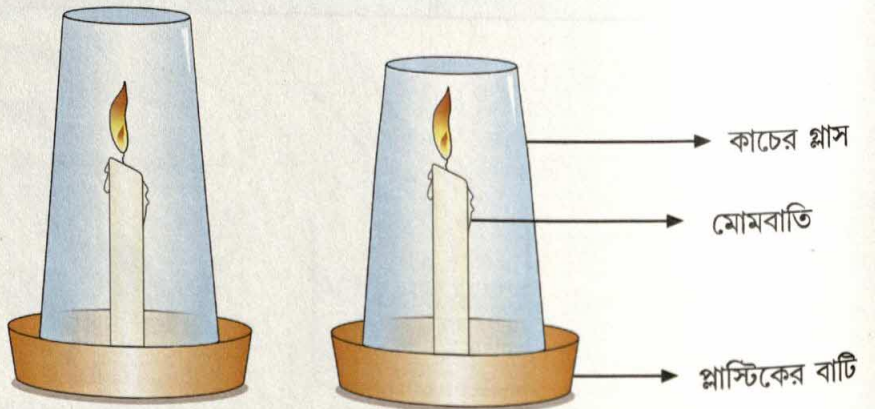
- বায়ুতে উপস্থিত অক্সিজেন কোন বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে।
- অক্সিজেন গ্যাস ফুরিয়ে গেলে দহন বন্ধ হয়ে যায়। তাই মোমবাতিও নিভে যায়।
- দহন হলে মোমবাতির উপাদানের সাথে বায়ুর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে। ফলে অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়।
- বায়ুর পরিমাণ কম হলে অক্সিজেনের পরিমাণও কম হবে, তাই মোমবাতি তাড়াতাড়ি নিভে যায়।
- প্রমাণিত হল বায়ুতে অক্সিজেন আছে এবং অক্সিজেন কোন বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে।

প্রাণীর শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজনের পরীক্ষা

আমাদের কাজ ৩

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে দুটি প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে রাখো। একটি ব্যাগ অর্ধেক জলপূর্ণ করে রাখো এবং অপর ব্যাগটি প্রায় পুরোটা জলপূর্ণ করে রাখো। দুটি ব্যাগে একটি করে একই ধরনের মাছ রাখো। এবার দুটি ব্যাগের মুখই রবার ব্যান্ড দিয়ে বন্ধ করে রেখে দাও। এই অবস্থায় ব্যাগ দুটি কয়েক ঘন্টা ফেলে রাখো।		

- অক্সিজেন গ্যাস জলে সামান্য দ্রবীভূত হয়। যেটুকু অংশ দ্রবীভূত হয় তা জলচর প্রাণীকে বাঁচতে সাহায্য করে।
- যে ব্যাগটি অর্ধেক জল পূর্ণ থাকে তার মধ্যে বায়ুর পরিমাণ বেশি, ফলে ঐ ব্যাগটিতে মাছটি বেশি সময় বাঁচে।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি

যখন বৃষ্টি হয় তখন তোমাদের মনে হয় এই জল এলো কোথা থেকে। বর্ষাকালে যে খালগুলিতে জল ভরে থাকে, গ্রীষ্মকালে তার অধিকাংশই একেবারেই শুকিয়ে যায়। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। এই জলীয় বাষ্প বায়ুতে আছে। ঠান্ডা হলে ঐ বাষ্প আবার জলকণায় পরিণত হয়।

জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির পরীক্ষা

আমাদের কাজ ৪

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
একটি স্টীলের গ্লাসকে ভালভাবে একটি শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে গ্লাসটির মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ রাখো।		

- জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হলে জলকণায় পরিণত হয়।
- বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে তা গ্লাসের বাইরের তলের সংস্পর্শে আসে। বাইরের তলটি ঠান্ডা থাকার জন্য জলীয় বাষ্প জমে জলকণার সৃষ্টি করে।
- সুতরাং প্রমাণিত হল বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে।
- গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে, তাই জল বাষ্পে পরিণত হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে, তাই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও কম থাকে।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি

কাঠ, কয়লা, কাগজ, রান্নাঘর গ্যাস ইত্যাদি পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুর একটি উপাদান।

বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উপস্থিতির পরীক্ষা

আমাদের কাজ ৫

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
একটি কাচের বোতলের প্লাস্টিকের ঢাকনাটিতে দুটি ছিদ্র করে সমকোণে বাঁকানো স্ট্র ঢুকিয়ে দাও। গলানো মোম দিয়ে স্ট্র ও ঢাকনার মধ্যের ফাঁক বন্ধ করো। বোতলের মধ্যে চুনজল নিয়ে ঢাকনাটি বন্ধ করে দাও। একটি স্ট্রয়ের (A) শেষ প্রান্ত চুনজলে ঢুকিয়ে দাও। অপরটির (B) শেষ প্রান্ত চুনজলের উপরে রাখ। (B) স্ট্রতে মুখ দিয়ে হাওয়া টেনে নাও।		
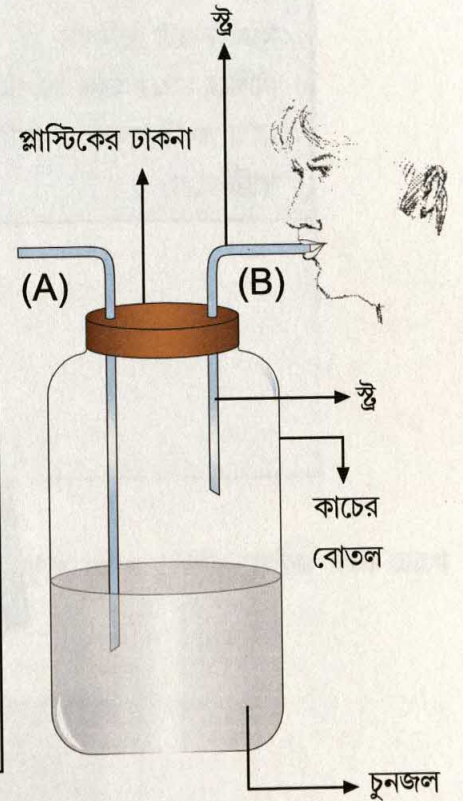
- কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনজলকে ঘোলা করে।
- বাড়িতে কিছুটা চুনজল একটি খোলা পাত্রে কিছুদিন রেখে দাও। দেখবে চুনজলের উপর একটি ঘোলা আস্তরণ পড়েছে। বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থাকার জন্য চুনজল ঘোলা হয়ে যায়।

আগুন নেভাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়

আমাদের কাজ ৬

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
সরু মুখযুক্ত একটি শিশি নাও। শিশির মধ্যে কিছুটা বেকিং পাউডার নিয়ে তার মধ্যে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে দাও। এবার শিশিটির মধ্যে একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরো।		

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র

- বুদ বুদ আকারে যে গ্যাসটি বেরিয়ে এলো সেটি হল কার্বন ডাইঅক্সাইড।
- কার্বন ডাইঅক্সাইড আগুন নেভাতে সাহায্যে করে।
- তোমরা অনেকেই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দেখেছো। কোথাও আগুন লাগলে ঐ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। ঐ যন্ত্রটি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের করে আগুন নেভানো হয়।
- তবে জেনে রাখো এই উপাদানগুলি ছাড়াও বায়ুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে গ্যাসটি আছে সেটি হল নাইট্রোজেন।
- এই উপাদানটি উদ্ভিদের প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদ বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে না। মাটিতে উপস্থিত কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেনকে এমন কিছু পদার্থে পরিণত করে যা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে।
- জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কয়েকটি সার তৈরির জন্য এমন কিছু পদার্থ দরকার যা নাইট্রোজেন ব্যবহার করে পাওয়া যায়।

বায়ুতে ধুলো ও ধোঁয়ার উপস্থিতি

বায়ুপ্রবাহের জন্য বায়ুতে প্রচুর ধুলিকণা উপস্থিত থাকে। কাঠ, কয়লা ও যানবাহনের জ্বালানীর দহনে ও বায়ুতে ধোঁয়া ও ধুলো মিশে যায়।

আমাদের কাজ ৭

কাজের বিবরণ	কী হল লেখো	কেন হল
বিদ্যালয়ের একটি ঘর বেছে নাও যে ঘরের অন্তত একটি জানালা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। ঘরের অন্যান্য জানালাগুলো কালো চার্ট পেপার বা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। একটি কালো চার্ট পেপারে ছোট একটি ফুটো করে সূর্যের অভিমুখী জানালায় চার্ট পেপারটি লাগিয়ে দাও।		

- ঘরের মধ্যে ধূলিকণাগুলি আলোর উপস্থিতিতে স্পষ্ট দেখা যায়। এই ধূলিকণাগুলি বায়ুতে ভেসে বেড়ায়। আমরা খালি চোখে সবসময় ধূলিকণাগুলি দেখতে পাই না।
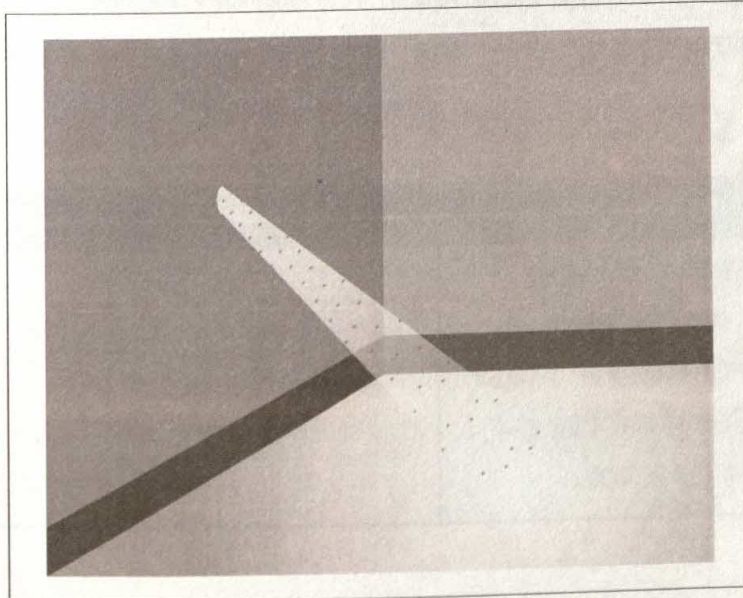
বায়ুদূষণ

আমরা যে বায়ু সমুদ্রের মধ্যে বাস করছি তা আর কতটা নির্মল আছে? বায়ুতে নানা প্রকার ক্ষতিকারক পদার্থ মিশে গিয়ে বায়ুকে দূষিত করে চলেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুদূষণের একটি প্রধান কারণ, এর জন্য বেশ কিছু ক্ষতিকারক গ্যাস বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের কাজ ৮

চার্ট তৈরি করো (শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে)

ধোঁয়া নির্গত হয় এমন কয়েকটি উৎসের নাম	উৎসগুলি থেকে নির্গত গ্যাসের নাম	গ্যাসগুলির ক্ষতিকর প্রভাব
১.	১.	
২.	২.	
৩.	৩.	
৪.	৪.	

- কাঠ কয়লা, জ্বালানী তেল পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যাসটি অত্যন্ত বিষাক্ত। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ছাড়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও উৎপন্ন হয়। এছাড়া সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসও মিশে যায়। এই গ্যাসটির জন্য অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।
- এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে বায়ুতে প্রচুর ধূলিকণা আছে। আবার বিভিন্ন পদার্থ জ্বালানোর জন্য কার্বন কণাও বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের কাজ ৯

কাজের বিবরণ	পর্যবেক্ষণ	কেন হল
দুটি পান পাতা বা আম পাতা নাও। দুটোতেই ভাল করে তেল মাখিয়ে নাও। এবার একটি পাতাকে দশ মিনিটের জন্য ও অপরটিকে কুড়ি মিনিটের জন্য মোমবাতির শিখার উপর ধরো।		

- মোমবাতির আংশিক দহনের ফলে কার্বন কণা ঐ পাতার তেলে আটকে যায়।
- যে পাতাটি বেশি সময় পর্যন্ত শিখার উপর ধরা হল সেই পাতাটি বেশি কালো হল। কারণ ঐ পাতার মধ্যে বেশি কার্বন কণা জমেছে।
- বিভিন্ন জ্বালানীর আংশিক দহনের জন্য এই কার্বন কণা বায়ুতে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে।
- এই কার্বণ কণা ও ধূলিকণার জন্য ফুসফুসের নানারকম জটিল রোগ হয়।
- ধোঁয়া নির্গতকারী কিছু উৎস হল — পেট্রল বা ডিজেল চালিত যানবাহন, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানী কয়লা ইত্যাদি।

বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব

- বায়ুদূষণের জন্য উদ্ভিদ, প্রাণী, বিভিন্ন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন রকম রোগের সৃষ্টি হয়।
- দীর্ঘদিন বায়ুদূষণের জন্য হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ, ক্যানসার হতে পারে।
- চামড়ার উপরও বায়ুদূষণের প্রভাব পড়ে।
- অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ফসলের ক্ষতি হয়।
- বিভিন্ন প্রাচীন সৌধগুলি অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও রেফ্রিজারেটারে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠ ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে।

বায়ুদূষণের প্রতিকার

বায়ুদূষণের কারণগুলি যখন চেনা গিয়েছে তখন অনেকাংশে এর প্রতিকারও সম্ভব।

- কারখানার ধোঁয়া নির্গতকারী চিমনিতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।
- জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহের শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- বৃক্ষরোপণ করতে হবে এবং গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে।
- গাড়ীতে সীসামুক্ত পেট্রল ব্যবহার করতে হবে।
- এমন আরো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

আমরা যা শিখলাম

- বায়ু কিছু জায়গা দখল করে।
- বায়ুতে প্রধানত নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প আছে।
- বায়ুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উপস্থিত আছে নাইট্রোজেন গ্যাস।
- নাইট্রোজেনের পরেই যে উপাদানটি বায়ুতে বেশি পরিমাণে আছে তা হল অক্সিজেন গ্যাস।
- অক্সিজেন গ্যাস আগুন জ্বলতে সাহায্য করে।
- অক্সিজেন গ্যাস জলে সামান্য দ্রবীভূত হয়।
- কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আগুন নেভাতে সাহায্য করে।
- কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চুনজলকে ঘোলা করে।
- বায়ুতে প্রচুর ধুলিকণাও আছে।
- বায়ুদূষণের জন্য বায়ুতে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উপস্থিত থাকলে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়।
- জীবের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন।

নিজে করে দেখো

১) একটি কাচের শিশি বা প্লাস্টিকের বোতল নাও। এর মধ্যে কিছু কাপড় কাচার সোডা নিয়ে তার মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে দাও।

- তুমি কী লক্ষ্য করলে?

এবার শিশির মধ্যে একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ঢুকিয়ে দাও।

- এবার কী লক্ষ্য করলে?
- কেন এমন হল?

সমস্ত পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তকে তালিকার আকারে লেখো।

২) কিছু কাঠের গুড়ো নিয়ে তার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে [illegible]ার আরেক স্থানে আরো কিছু কাঠের গুড়ো রেখে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে বালি চাপা দেওয়া হল।

- কোন্ ক্ষেত্রে কী লক্ষ্য করলে?
- কেন এমন হল?

সমস্ত পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তকে তালিকার আকারে লেখো।

৩) একটি বাটিতে সামান্য জল নিয়ে তাপ দাও। প্রথমে জল ফুটতে থাকে। পরে আরো গরম করলে জল দেখতে পাওয়া যায় না। জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মিশে যায়।

- বায়ুতে জলীয় বাষ্প যে মিশে গেলো তা' দেখানোর জন্য তুমি অন্য কোনো পরীক্ষা দেখাও।

৪) তোমার বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে কোনো একটি স্থানে একটি পরিষ্কার সাদা কাপড় ঝুলিয়ে রাখো।

- দুদিন পর কাপড়টি লক্ষ্য করো।
- কাপড়টি এমন হল কেন?

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক. বায়ুর উপাদানগুলির মধ্যে ———————— গ্যাস কোন বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে।

খ. বায়ুতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ————————।

গ. জলীয় বাষ্পকে ঠান্ডা করলে ———————— পরিণত হয়।

ঘ. বায়ুতে উপস্থিত ———————— ও ———————— গ্যাস দহনে সহায়তা করে না।

ঙ. বায়ুতে উপস্থিত ———————— গ্যাস চুনজলকে ঘোলা করে।

২) সত্য না মিথ্যা লেখো।

ক. বায়ুতে একাধিক গ্যাসীয় পদার্থ আছে।

খ. বায়ু কোনো জায়গা দখল করে না।

গ. কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি ছাড়া দহন ঘটে না।

ঘ. জলচর প্রাণীরা বেঁচে থাকে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে।

ঙ. সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উপস্থিত থাকলে বায়ুর দূষণ ঘটেনা।

৩) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. কাঠকয়লা, জ্বালানী তেল পোড়ালে বায়ুতে কোন্ বিষাক্ত গ্যাসটি ছড়িয়ে পড়ে?

খ. কিছু কাঠের গুড়োর মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে বালি চাপা দিলে আগুন নিভে যায় কেন?

গ. অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী এমন একটি গ্যাসের নাম লেখো।

ঘ. অ্যাসিড বৃষ্টির একটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।

ঙ. কোনো স্থানে আগুন লাগলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছড়িয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আগুনের সংস্পর্শ থেকে কোন্‌টিকে সরিয়ে দেয়া হয়?

৪) সঠিক উত্তরটি বেছে নাও।

ক. বায়ুতে উপস্থিত উপাদানগুলির কোন্‌টি ঠিক পরিমাণ নির্দেশ করো —

১। ৭৮% অক্সিজেন, ২১% নাইট্রোজেন এবং ১% অন্যান্য গ্যাস।

২। ২১% অক্সিজেন, ৭৮% নাইট্রোজেন এবং ১% অন্যান্য গ্যাস।

৩। ২২% অক্সিজেন, ৭৮% নাইট্রোজেন।

৪। ৭৮% অক্সিজেন, ২২% নাইট্রোজেন।

খ. প্রাচীন সৌধগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বায়ুদূষণে উৎপন্ন যে গ্যাসটির দ্বারা সেটি হল —

১। কার্বনমনোক্সাইড।

২। সালফার ডাইঅক্সাইড।

৩। অক্সিজেন।

৪। নাইট্রোজেন।

গ. চুনজলকে ঘোলা করে —

১। অক্সিজেন গ্যাস।

২। হাইড্রোজেন গ্যাস।

৩। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস।

৪। নাইট্রোজেন গ্যাস।

ঘ. জলে যে গ্যাসটি দ্রবীভূত থাকায় জলচর প্রাণীরা বাঁচতে পারে সেই গ্যাসটি হল —

১। কার্বন ডাইঅক্সাইড।

২। অক্সিজেন।

৩। নাইট্রোজেন।

৪। সালফার ডাইঅক্সাইড।

৫) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

ক. বায়ুর চারটি প্রধান উপাদান কী কী? এর মধ্যে কোন্ উপাদানটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?

খ. অক্সিজেন কোন বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে তা' কীভাবে প্রমাণ করবে?

গ. বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আছে তা' কীভাবে প্রমাণ করবে?

ঘ. বায়ুদূষণের তিনটি উৎসের নাম লেখো। এই উৎসগুলি কীভাবে বায়ুকে দূষিত করে?

ঙ. বায়ুদূষণ প্রতিকারের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করো।

৬) নীচের তালিকাটি সম্পূর্ণ করো।

কাজের বিবরণ	পর্যবেক্ষণ	কারণ
দুটি স্টীলের গ্লাস নিয়ে একটিতে জল রাখো এবং অপরটিতে কিছু বরফের টুকরো রাখো।	১) প্রথম গ্লাসটির বাইরের গায়ে জলকণা জমতে দেখা যায় না। ২) দ্বিতীয় গ্লাসটির বাইরের গায়ে জলকণা জমতে দেখা যায়।	

৫খ জল

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করে থাকি। তোমরা প্রতিদিন পান করা ছাড়া আর কোন কোন কাজে জল ব্যবহার কর ?

আমাদের কাজ ১

তোমরা প্রতিদিন যে সমস্ত কাজে জল-এর ব্যবহার কর তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো —

সারণী - ১

	ব্যবহার
জল	পান করা, রান্না করা,.......................

নীচের সারণীটিতে কয়েকটি কাজের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যেখানে জলের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে একটি তালিকা তৈরী করো এবং ঐ সমস্ত কাজে তোমার পরিবার দৈনন্দিন আনুমানিক কতটা পরিমাণ জল ব্যবহার করে তা লিপিবদ্ধ করো।

সারণী - ২

দৈনন্দিন কাজ	পরিমাণ (আনুমানিক)
পান করার জন্য	. . . . . . লিটার
স্নান করার জন্য	
পরিবারের ব্যবহৃত মোট জলের পরিমাণ	=

তোমরা জলের অনেকগুলি ব্যবহার তালিকাভুক্ত করেছো। তোমরা কি মনে করো ঐগুলি ছাড়া আমাদের জীবনে জলের আর কোনো ব্যবহার নেই? আমরা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করি (চাল, গম, সবজী ইত্যাদি) তার চাষের জন্য কি জলের প্রয়োজন হয় না ? এরকম আরও কিছু ব্যবহার উল্লেখ করো —

____

____

____

জল আমরা কীভাবে বা কোথায় পাই (যে সমস্ত স্থানে তোমরা জল দেখেছো) ? তোমরা নীচের সারণীটির অনুরূপ একটি ছক নিজেদের খাতায় লিখে ছকটি পূরণ করো। তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ক্ষেত্রে জলের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছো তা কাজে লাগিয়ে নিম্নলিখিত ছকটি পূরণ করো —

সারণী - ৩

	জলের প্রাপ্তিস্থান
জল	নদী
	________
	________
	________
	________
	________
	________
	________
	________
	________
	________

তোমরা দেখেছো নদী, নালা, নলকূপ থেকে জল পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা কি কখনও ভেবেছো নদীতে জল কীভাবে আসে ? কীভাবে নলকূপে জল আসে ? তোমরা জানো পৃথিবীর উপর প্রায় তিনভাগের দুভাগ জল থাকে এবং তার বেশীর ভাগটাই থাকে সমুদ্র, নদী, নালায়। তোমরা যে তালিকাটি তৈরি করলে সেটি দেখে এবার বলো কোন জলের উৎস মাটির নীচে আর কোন জলের উৎস মাটির উপরে।

জলের বিভিন্ন উৎসের তালিকা

নিজে করো ঃ

সারণী - ৪ক

উৎস	প্রাপ্তিস্থান
নদী	মাটির উপরে / ভূপৃষ্ঠ

উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

তাহলে তোমরা দেখলে পৃথিবীর জলের উৎস আসলে দুটি। মাটির নীচের জল এবং মাটির উপরের জল যা আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে পাই। যেমন নদী, সাগর, পুকুর ইত্যাদি। তোমরা কি বলতে পারো কোন জলের স্বাদ কেমন ?

নিজে করো ঃ

৩ নং সারণীতে যে সমস্ত উৎসের নাম তোমরা লিখেছো, তার কোনটার স্বাদ কিরকম তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়, কূপ বা নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত তালিকাটি পূরণ করো।

সারণী - ৪খ

উৎস	স্বাদ
নলকূপ	স্বাদু / মিঠা

প্রয়োজনে শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

> **সতর্কতা ঃ** জলের স্বাদ বোঝার জন্য সব ধরনের জল পান করার প্রয়োজন নেই। আঙ্গুলের সাহায্যে জিভে স্পর্শ করেই স্বাদ অনুভব করা যায়। তারপর মুখ ভাল করে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলো।

আমাদের কাজ ২

দুটি ছোট বিকার নাও, একটি বিকারে পুকুরের / কুয়োর জল সংগ্রহ করো, আর অপরটিতে নলকূপ বা টিউবওয়েলের জল সংগ্রহ করো। তারপর একটি চামচের সাহায্যে গায়ে মাখা সাবানের ছোট কয়েকটি টুকরো প্রতিটি বিকারের জলে মিশিয়ে দাও। তারপর চামচটির সাহায্যে গুলতে শুরু করো। এবার তোমরা যা লক্ষ্য করছো সেটি নিচের ছকটিতে লিখে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে দেখিয়ে নাও।

সারণী - ৫

নং	বিকারে রাখা জলটি যখন	সাবানের টুকরো মেশানোর ফলে যা হল
১	পুকুরের জল / কুয়োর জল	
২	নলকূপের জল	

তোমরা কি বলতে পারো কেন কুয়োর জলে ফেনা হল না ? আর কেনই বা নলকূপের জলে ফেনা হল ?

____

____

____

____

- তোমরা দেখলে প্রথম বিকারের রাখা জলে গায়ে মাখা সাবান মেশানোর ফলে ফেনা তৈরি হল না বা অল্প পরিমাণে হল। তার কারণ জলের মধ্যে উপস্থিত কিছু লবণ — এই ধরনের জলকে আমরা খর জল বলি।
- দ্বিতীয় বিকারে রাখা জলে গায়ে মাখা সাবান মেশানোর ফলে বেশী ফেনা তৈরী হল। কারণ এই জলে ঐ সমস্ত লবণের অনুপস্থিতি বা কম পরিমাণে উপস্থিতি। এই ধরনের জলকে আমরা মৃদু জল বলি।

আমাদের কাজ ৩

প্রথমে দুটি বিকার নেওয়া হল। দুটি বিকারের একটিতে নলকূপের পরিষ্কার জল ঢালা হল আর অপরটিতে পুকুরের ঘোলা জল ঢালা হল। এবার তোমরা ভেবে দেখো এর মধ্যে তোমরা কোন জল পান করতে চাইবে —

সারণী - ৬

নং	বিকারে রাখা জলটি যখন	প্রকৃতি	কোনটি পান করবে / করবে না এবং তার কারণ
১	নলকূপের জল	পরিষ্কার	
২	পুকুরের জল		

তোমরা কেন পুকুরের জলটি পান করবে না তার কারণ কী বলতে পারো ?

____

____

পেয় জল সেই জলকে বলা হয় যা স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন, ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও অশুদ্ধি বিহীন। পেয় জলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এছাড়াও সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ স্বল্পমাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়। যে ধরনের জল পান করা যায় তাদের **পেয় জল** বলি আর যে ধরনের জল পান করা যায় না তাদের **অপেয় জল** বলে থাকি। তাহলে এবার ভেবে দেখো তোমরা প্রথমে যে সব জায়গা থেকে জল সংগ্রহ করেছিলে তাদের মধ্যে কোনটি পেয় জল আর কোনটি অপেয়।

সারণী - ৭

উৎস	পেয় / অপেয়
পুকুর	অপেয়
নদী	

তালিকাটি সম্পূর্ণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও। তালিকাটি সম্পূর্ণ করে শিক্ষক / শিক্ষিকার মহাশয়কে দেখিয়ে নাও।

তোমরা দেখলে যে সমস্ত উৎস থেকে তোমরা জল-এর নমুনা সংগ্রহ করেছো তার মধ্যে কিছু উৎসের জল অপেয় প্রকৃতির। যেমন - পুকুরের জল হল অপেয়। এই অপেয় জল পরিশোধন করার পর পেয় জলে পরিবর্তিত করা যায় কিনা দেখা যাক।

নিজে করো ঃ

প্রথমে চারটি মাটির ঘট নাও যার মধ্যে তিনটি ঘটের তলদেশ ছিদ্রযুক্ত। তিনটি পলতে, কিছু পরিমাণ বালি, কিছুটা চারকোল এবং কিছুটা ফিটকিরি নাও। বিকারে কিছু পরিমাণ পুকুরের জল নাও।

সারণী - ৮

পরীক্ষা		কী দেখলে	কারণ কী ?
ছিদ্রযুক্ত ঘটগুলি একটির উপর অপরটি রাখা হল। তিনটি ছিদ্রে তিনটি পলতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তিনটি ঘটের সবথেকে উপরেরটিতে বালি, তার পরেরটিতে চারকোল আর নীচেরটিতে ফিটকিরি দিয়ে পাত্রের অর্ধেক অংশ ভর্ত্তি করা হল। এই তিনটি ঘটের নীচে ছিদ্রহীন ঘটটি রাখা হল। সবশেষে, বালিযুক্ত উপরের ঘটটিতে বিকারে রাখা পুকুরের জল ঢালা হল এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হল।	বালি চারকোল ফিটকিরি খালি		

সারণীটি নিজের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

এ বিষয়ে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা লেখো।

____

____

____

জেনে রাখো ঃ সাধারণ জল ফুটিয়ে বা ক্লোরিন যোগ করে পানযোগ্য করে তোলা যেতে পারে।

কয়েকটি আধুনিক জল পরিশোধন যন্ত্র

আমাদের কাজ ৪

এবার তোমরা একটু ভালো করে ভেবে দেখো আর বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত জলের ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরী করো। তোমরা আগেই বিভিন্ন উৎসের নাম ও প্রাপ্ত জলের তালিকা প্রস্তুত করেছো। এখন কেবল ঐ সব ধরনের উৎস থেকে প্রাপ্ত জলের বিভিন্ন ব্যবহার উল্লেখ করো।

সারণী - ৯

নং	উৎস	ব্যবহার
১	নদী	
২	পুকুর	

এই ধরনের একটি তালিকা তোমাদের খাতায় বানিয়ে, তা পূরণ করে শিক্ষক / শিক্ষিকাকে দেখাও।

জলদূষণ নানা কারণে ঘটে, যেমন —

১) কল-কারখানাগুলির উপজাত দ্রব্য নদীতে এসে পড়ে। এই দ্রব্যের মধ্যে পোড়া তেল, গ্রীজ, ফেনল, অ্যাসিড, সায়ানাইড, বিভিন্ন ধাতব কণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২) আবাসন থেকে নির্গত বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ যেমন মলমূত্র, কাগজ, কাপড়, সাবান, খাবার ইত্যাদি।

৩) বিভিন্ন কীটনাশক যেমন, অলড্রিন, ডি.ডি.টি., বি.এইচ.সি, চাষের ক্ষেত থেকে বাহিত হয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে মেশে।

৪) কীটনাশক, কাঠ সংরক্ষণ, রং উৎপাদন ও কাচের সামগ্রী উৎপাদন শিল্প থেকে উৎপন্ন আর্সেনিক জলাশয়ে সঞ্চিত হয়।

৫) সিরামিক শিল্প, সার শিল্প ও কীটনাশক শিল্প থেকে উৎপন্ন ফ্লুরাইড বিভিন্ন জলাশয়ে মেশে।

৬) নদী, পুকুরে স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদির জন্য।

এবার বলো তো এইসব ব্যবহারের ফলে কোথাও কোনো রূপ দূষণ হচ্ছে কি না ? যদি হয় তার একটি তালিকা তৈরী করো।

সারণী - ১০

নং	উৎস	দূষণের কারণ	দূষক পদার্থ
১	পুকুরের জল		
২	নদীর জল		

জেনে রাখো ঃ পরিষ্কার জলের মধ্যে জলের স্বাভাবিক উপাদান ছাড়া অন্যান্য জৈব ও অজৈব উপাদান মিশে গিয়ে ঐ জলের শুদ্ধতা নষ্ট করলে তাকে জলদূষণ বলে।

জেনে রাখো ঃ

- মাটির উপরের জলের মতো মাটির নীচের জলও দূষিত হয়। আমরা নলকূপ থেকে যে জল পাই সেটিও অনেক সময় দূষিত হয়। প্রধানত আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড এই সমস্ত দূষণের কারণ।
- আর্সেনিক দূষণের ফলে দেহের বিভিন্ন জায়গায় কালো দাগ, পায়ের তলায় মাংসপিন্ডের সৃষ্টি, ত্বকের পচন ইত্যাদি রোগ দেখা যায়।
- ফ্লুরাইড দূষণের ফলে হাড় এবং দাঁতের ক্ষয় হয়।

তোমরা তো জানো সর্বদা পরিষ্কার বা পরিশোধিত জল পান করা উচিত। আর অপরিশোধিত জল পান করলে কিছু রোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে দূষিত / অপরিশোধিত জল পান করলে কী রোগ হতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো —

সারণী - ১১
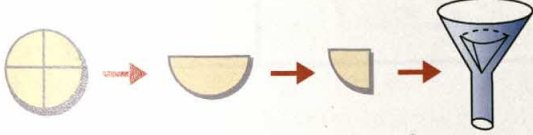
নং	দূষণের উৎস	কী রোগ দেখা যায়
১	মানুষের দ্বারা জলদূষণ	
২	কল-কারখানার মাধ্যমে জলদূষণ	

কিছু জলবাহিত রোগের নাম হল — কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, জন্ডিস, আন্ত্রিক, পোলিও ইত্যাদি।

নিজে করো ঃ

প্রথমে ৪ টি কাঁচের বোতল নাও। একটি পাত্রে পুকুরের / জলাশয়ের জল নাও। কয়েকটি ফিল্টার পেপার নাও। ২ টি ফানেল নাও। আরেকটি পাত্রে টিউবওয়েলের জল নাও।

সারণী - ১২

কী করবে	কী দেখলে	কেন হল
১. একটি কাঁচের বোতলে জলাশয়ের জল এবং অপর একটি বোতলে নলকূপের জল সংগ্রহ করো। ২. দুটি ফিল্টার পেপার নিচের ছবির মতো পদ্ধতিতে ভাঁজ করে ফানেলে লাগাও। (ফিল্টার পেপার ভাঁজ করে রাখার পদ্ধতি) ৩. ঐ ফানেল দুটি খালি বোতলদুটির মুখে বসাও। ৪. তারপর সংগৃহীত পুকুরের জল ও নলকূপের জল ফিল্টার পেপারের উপর দিয়ে ঢালো এবং পরিশ্রুত জল-এর নমুনা দুটি সংগ্রহ করো। ৫. শেষে জল-এর নমুনা দুটি এবং ফিল্টার পেপার দুটি লক্ষ্য করো।		

কোন জলটি দূষিত এবং তার কারণ সম্বন্ধে তোমার ধারণা উল্লেখ করো।

____

____

বিভিন্ন ধরনের জলদূষণ সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা আছে তা কাজে লাগিয়ে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় বর্ণনা করো।

সারণী - ১৩

নং	দূষণের প্রকার	কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে
১	নদীর জলের দূষণ	
২	পুকুরের জলদূষণ	

জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় বা পথ —

১) কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে সরাসরি জলে ফেলা বন্ধ করা।

২) নদী, পুকুরে কাপড় কাচা, স্নান করা, ইত্যাদি বন্ধ করা।

৩) পয়ঃপ্রণালীগুলির উন্নতি, আবর্জনাগুলির জারণ ট্যাঙ্কে অণুজীবের মাধ্যমে পরিবর্তন।

৪) নদীগুলির গভীরতা এবং প্রবাহমানতা বজায় রাখা।

৫) গোবর গ্যাস এবং জৈব সারের উৎপাদন।

তোমরা কি ভেবে দেখেছো পৃথিবীর সব জীব এত জল ব্যবহার করছে তা সত্ত্বেও জলের পরিমাণ প্রকৃতিতে কী করে বজায় থাকে। জামা-কাপড় কাচার পর ভিজে কাপড়ের জল কোথায় যায় ? গাছ যে জল নেয় তার অতিরিক্ত জল কোথায় যায়? কেন মেঘ হয় ? বৃষ্টি কী ভাবে হয় ? চলো কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষা করা যাক —

নিজে করো ঃ

দুটি চওড়া মুখ ও তলদেশযুক্ত কাচের পাত্র নেওয়া হল। প্রতিটি পাত্রে সমান পরিমাণ জল দেওয়া হল। একটি পাত্রকে রোদে রাখা হল, আর একটিকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হল। জলের মাপ বোঝার জন্য উপরিতল চিহ্নিত করা হল। কয়েক ঘন্টা পর কী পরিবর্তন হল দেখো।

সারণী - ১৪

নং	স্থান	কী হল	কারণ
১	রোদে রাখা পাত্র		
২	ছায়াতে রাখা পাত্র		

এ বিষয়ে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা লেখো।

তাহলে আমরা দেখলাম জল বাতাসে মিশে গেছে। এই ভাবেই বিভিন্ন জলাশয়ের জল, ভেজা কাপড়ের জল ইত্যাদি বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এবার দেখা যাক গাছ যে জল ব্যবহার করে তা কীভাবে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয় ?

নিজে করো ঃ

একটি টবসমেত সতেজ গাছ রোদে রাখা হল। তারপর একটি স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে গাছটি ঢেকে দেওয়া হল। এমনভাবে ঢাকা হল যাতে বাইরের বাতাস প্রবেশ না করে। কী হল লক্ষ্য করার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।

সারণী - ১৫

পরীক্ষা	কী হল	কেন হল

যদি কোনো প্রশ্ন থাকে লেখো ।

____

____
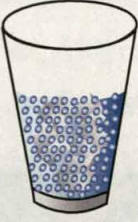
তাহলে আমরা দেখলাম যে, গাছ তার দেহের অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বাইরে বের করে দেয়। এবার একটু ভেবে দেখো তো প্রাণীরা কীভাবে দেহের অতিরিক্ত জল পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় ? নীচের তালিকাটি পূরণ করো —

সারণী - ১৬

	কী ভাবে
প্রাণী	(i) (ii)

তাহলে তোমরা দেখলে বিভিন্ন উপায়ে জল বাষ্প হয়ে পরিবেশে মুক্ত হয়। এখন একটু ভেবে দেখ এত পরিমাণ জল বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে যায় তারপর কোনো এক সময় তো বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প চলে আসবে তখন কী হবে ? এটা বোঝার জন্য আমরা একটি পরীক্ষা করতে পারি।

নিজে করো ঃ

পরীক্ষা	কী হল	কারণ
একটি কাঁচের গ্লাস নাও। তার মধ্যে কিছু পরিমাণ জল নাও। কয়েকটি টুকরো বরফ নাও। ঐ বরফ জলে মিশিয়ে দাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।		

কেন কাঁচের গ্লাসটির বাইরের গায়ে জলের বিন্দু দেখতে পেলে ?

____

____

ঠিক যে ভাবে দেখলে গ্লাসের গায়ে জলের বিন্দু জমা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই জলীয় বাষ্প প্রথমে বাতাসের ধুলো-বালির সাথে মিশে মেঘ হয়। তারপর ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে। আবার এসব জল সমস্ত জলাশয়ে এবং ভূগর্ভেও চলে যায়।

এবার একটু ভেবে দেখো, এত জল পৃথিবীতে আছে কিন্তু তার বেশীরভাগই হল সমুদ্রের জল। সমুদ্রের জল লোনা। আমরা পান করতে বা অন্য কোন কাজে লাগাতে পারি না। বৃষ্টির মাধ্যমে যে জল পাই তার বেশিরভাগই নদী-নালা দিয়ে সমুদ্রে মিশে যায়। যেটুকু মাটির উপর পড়ে তার খুব কম অংশই মাটির নীচে যেতে পারে। আমরা পানের জন্য বা চাষের জন্য যে নলকূপের জল ব্যবহার করি - সেই জল আসে মাটির নীচ থেকে। আর এভাবেই মাটির নীচের জল ভীষণ ভাবে কমে যাচ্ছে। একটা সময় আসবে যখন মাটির নীচ থেকে আর জল পাওয়া যাবে না।

সেই কারণে তোমরা একটু ভালো করে চিন্তা করে কিছু উপায় বের করো যার সাহায্যে আমরা বৃষ্টির জল সমুদ্রে যাওয়ার আগেই সংরক্ষণ করতে পারি।

	সংরক্ষণের উপায়
বৃষ্টির জল	

বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উপায় —

বাড়ির ছাদে — এই পদ্ধতিতে বৃষ্টির জল কোন বাড়ির ছাদ থেকে পাইপের মাধ্যমে একটি ট্যাঙ্কে জমা করা হয়। এই জলে ছাদের মাটি, ধুলো ইত্যাদি মিশে থাকতে পারে এবং ব্যবহারের আগে এই জলকে পরিস্রাবণ করতে হয়। অনেক সময় পাইপগুলি সরাসরি মাটির ভিতরে একটি গর্তে নিয়ে যাওয়া হয়। এই জল তখন মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভস্থ জলে গিয়ে মেশে।

মাটির তলার জলাধার — বৃষ্টির জল রাস্তার পাশের ড্রেন থেকে সরাসরি মাটিতে গিয়ে মেশে।

আমরা যা শিখলাম ঃ

- জল জীবনের জন্য অপরিহার্য্য।
- উৎস হিসাবে জল দু ধরনের — (i) ভূপৃষ্ঠের জল (ii) ভূগর্ভস্থ জল।
- স্বাদ অনুসারে আবার জল দুপ্রকারের — (i) স্বাদু জল / মিঠা জল (ii) লোনা জল।
- পানের যোগ্যতা অনুযায়ী জল দু ধরনের — (i) পেয় জল (ii) অপেয় জল।
- জলে দ্রবীভূত লবণের ধরনের উপর নির্ভর ক'রে জল দু প্রকারের — (i) মৃদু জল (ii) খর জল।
- জল বিভিন্ন উৎস থেকে পাই এবং তা আমরা নানা কাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি।
- পুকুরের জলে স্নান করা, বাসন মাজা, গবাদি পশু স্নান করানোর মাধ্যমে, কৃষিকাজে কীটনাশক ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে, কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে, জলপথে বিভিন্ন যান বাহন চালানোর মাধ্যমে আমরা জলদূষণ করছি এবং বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ তৈরী করছি।
- ভূপৃষ্ঠের জলের মতো ভূগর্ভস্থ জলেও দূষণ ঘটে। আর্সেনিক, ফ্লুরাইড প্রভৃতি পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য ভূগর্ভস্থ জল দুষিত হয় এবং তার ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।
- সমস্ত জীবকুল বিভিন্নভাবে জলকে ব্যবহার করার পর অতিরিক্ত পরিমাণ জল পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়, আবার জলাশয়ের জলও সূর্যালোকের প্রভাবে পরিবেশে ফিরে যায়।
- এই বাষ্প বাতাসের ধূলোর সাথে মিশে প্রথমে মেঘ তৈরী হচ্ছে আর সেই মেঘ থেকে পরে ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি আকারে পৃথিবীতে ফিরে আসছে।
- এই বৃষ্টির জল আবার জলাশয়ে ফিরে যায়। পৃথিবীর বেশীরভাগ জল-ই হল সমুদ্রের জল, যে জল দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের অযোগ্য। তার ফলে ব্যবহার যোগ্য জলের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।
- সেই কারণেই জল সংরক্ষণ প্রয়োজন।
- সাধারণত দুটি উপায়ে আমরা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে পারি —

  ক) বাড়ির ছাদে

  খ) মাটির তলার জলাধারে
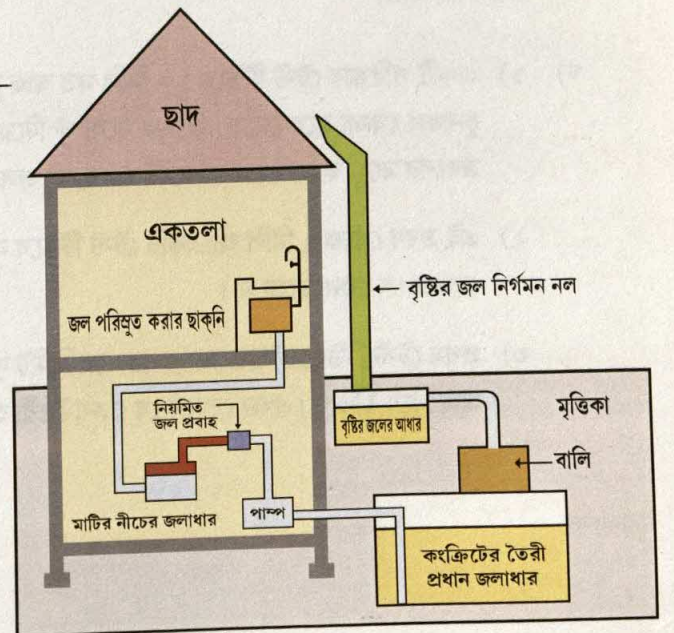
নিজে করে দেখো ঃ

১) **জলচক্র ঃ**

ক) প্রয়োজনীয় উপকরণ — একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিক ব্যাগ, জল, একটি ছোট স্বচ্ছ প্লাস্টিক কাপ।

খ) ১) প্লাস্টিক কাপটির অর্ধেক হালকা গরম জল দিয়ে ভর্তি করে সেটিকে শুকনো প্লাস্টিক ব্যাগে রাখো এবং ব্যাগটির মুখ ভালো ভাবে আটকে দাও।

২) ব্যাগটি রোদ আসে এমন একটি জানালার সামনে রাখো।

৩) কাপে ঢালা জলের স্তর বোঝানোর জন্য ব্যাগের বাইরে একটা দাগ দাও।

৪) এই অবস্থায় ব্যাগটির একটি ছবি আঁকো অথবা ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখো।

৫) দ্বিতীয় দিনে বাষ্পীভবনের কারণে কাপে রাখা জলের স্তর খানিকটা কমে যাবে। জলের নতুন স্তরটিকেও দাগ দিয়ে রাখো।

৬) ব্যাগের উপর দিকটা মেঘের মত দেখাতে পারে, সেটি লক্ষ্য করো।

৭) ব্যাগটির পাশে এবং নীচের দিকে ঘনীভবনের কারণে জল কণা দেখা যাবে।

৮) প্রত্যেকটি ধাপের ছবি আঁকো অথবা ছবি তুলে খাতায় আটকাও।

২) অস্থায়ী খর জলের একটি নমুনার প্রস্তুতি এবং সেটির মৃদুকরণ

ক) প্রয়োজনীয় উপকরণ — ১০ মিলি স্বচ্ছ চুন জল, ২টি পরিষ্কার টেস্ট টিউব, একটি স্ট্র, সাবান জল, স্পিরিট ল্যাম্প, টেস্ট টিউব হোল্ডার।

খ) ১) একটি পরিস্কার টেস্ট টিউবে ১০ মিলি মত স্বচ্ছ চুনজল নাও। একটি স্ট্রয়ের মাধ্যমে চুনজলের মধ্যে ফুঁ দাও। দেখবে চুনজল ঘোলা হয়ে গেছে। জলের মধ্যে ফুঁ দিয়ে যাও, যতক্ষণ না চুনজলের ঘোলাটে ভাব চলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে দ্রবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে, যা জলকে অস্থায়ীভাবে খর করে তোলে।

২) এই দ্রবণ থেকে ২ মিলি আরেকটি টেস্ট টিউবে নাও। এই দ্রবণে কয়েক ফোঁটা সাবান জল দাও এবং জোরে ঝাঁকাও। দেখবে যে ফেনা হচ্ছে না।

৩) প্রথম টেস্ট টিউবকে আগুনের ওপর ধরে মিনিট দুয়েক ফোটাও। ঠান্ডা হওয়ার পর, এতে আবার কয়েক ফোঁটা সাবান জল দিয়ে ঝাঁকাও। এখন দেখবে যে ফেনা তৈরী হচ্ছে।

অনুশীলনী ঃ

১) শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

ক) পানীয় জলে ---------------, ---------------, -------------- প্রভৃতি লবণ বেশী পরিমাণে থাকে না।

খ) জলের মধ্যে -------------------- পদার্থ মিশে গেলে জলদূষণ ঘটে।

গ) জলবাহিত একটি রোগের নাম হল --------------------।

২) কয়েকটি কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) যে জলে সাবান মেশালে ফেনা হয় না, তাকে কী বলে ?

খ) লোনা জলের একটি উৎসের নাম লেখো।

গ) পেয় জল কোথায় পাওয়া যায় ?

৩) সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

ক) জল দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কী কী কাজে লাগে ?

খ) রোদ ঝলমলে দিনে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় কেন ?

গ) জলদূষণ কীভাবে হয় ?

ঘ) জল সংরক্ষণ কীভাবে করা যেতে পারে ?

৪) পার্থক্য লেখ ঃ

ক) মৃদু জল ও খর জল

খ) পেয়জল ও অপেয় জল

মৃত্তিকা

আমাদের কাজ ১

(দলে ভাগ হয়ে কাজটা করো)

তোমার চারপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিমাণমতো মাটি জোগাড় করে আনো। বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করে আনা মাটির নমুনাগুলোকে আলাদা আলাদা সাদা কাগজের ওপর ছড়িয়ে দাও। আর ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো। প্রয়োজনে আতস কাঁচ (Magnifying Glass) - এর সাহায্য নাও।

সারণী - ১

কোথাকার মাটি	মাটিতে পাওয়া উদ্ভিদ/তার অংশ	মাটিতে পাওয়া প্রাণী/ তার দেহের অংশ	মন্তব্য
১. রাস্তার পাশে			
২. বাগান			
৩.			
৪.			
৫.			

- মাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।
- মাটি আবার অনেক ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস করার জায়গাও বটে।
- আবার বিভিন্ন ফসল ফলানোর জন্যও মাটি প্রয়োজন।

আমাদের কাজ ২

(৪ জনের দলে ভাগ হয়ে কাজটা করো)

১. পরিমাণ মতো মাটি নাও। মাটি থেকে পাথরের টুকরো, গাছের শেকড়-এর মতো বড়ো অংশগুলো বাদ দাও।

২. মাটির নমুনাটিকে হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নাও।

৩. একটা স্বচ্ছ কাঁচের বা প্লাস্টিকের গ্লাস / বিকার -এ জল নাও।

৪. মাটির নমুনাটি বিকারে নিয়ে ভাল করে জলে গুলে নাও।

৫. বিকারটিকে ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ না নাড়িয়ে রেখে দাও।

সারণী - ২

কী দেখছো পরপর লেখো ঃ

(অ) একদম ওপরের স্তর ঃ	
(আ) তার নীচের স্তর ঃ	
(ই) তার নীচের স্তর ঃ	
(ঈ) তার নীচের স্তর ঃ	
(উ) তার নীচের স্তর ঃ	

- মাটিতে পরিষ্কার কয়েকটা স্তর লক্ষ্য করা যায়।
- সাধারণভাবে মাটির সবচেয়ে ওপরের স্তরটাই আমাদের চোখে পড়ে।
- বাড়ি তৈরী বা কুয়ো খোঁড়া বা অন্য কোনো কাজের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়লে, মাটির এই বিভিন্ন স্তর খুব সহজেই চোখে পড়ে।
- মাটির সবচেয়ে ওপরের স্তরটা সাধারণত কালো রঙের হয়, কারণ এই স্তরে হিউমাস বা জৈব বস্তু আর খনিজ পদার্থ থাকে। হিউমাস থাকার জন্যই মাটি উর্বর হয়।

মাটির বিভিন্ন স্তর
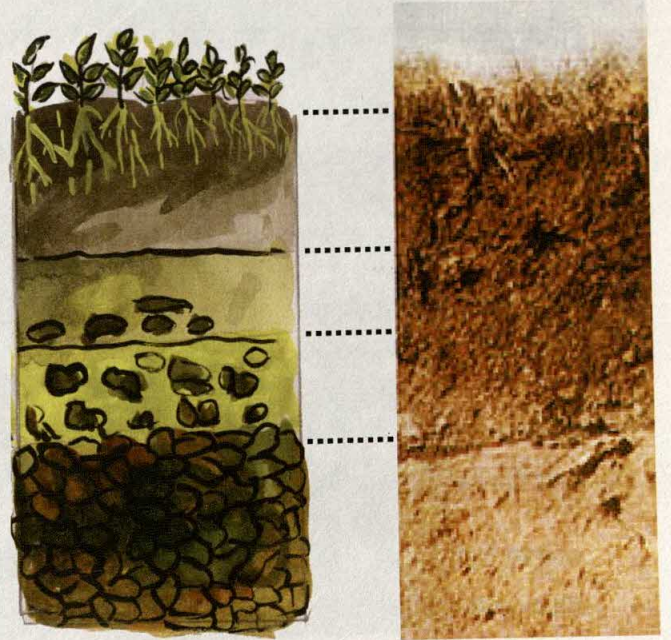
প্রকৃতিতে মাটির বিভিন্ন স্তর

আমাদের কাজ ৩

১. যে কোনো জায়গা থেকে পরিমাণমত মাটির নমুনা নিয়ে এসো।

২. মাটির নমুনাটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

৩. মাটিতে অস্বাভাবিক কোনো উপাদান থাকলে পরপর তার তালিকা প্রস্তুত করো।

সারণী - ৩

মাটির স্বাভাবিক উপাদান	মাটির অস্বাভাবিক উপাদান	মন্তব্য

- মাটির কণা, অজৈব ও জৈব পদার্থ, জল, বায়ু আর সজীব পদার্থ — এরাই হল মাটির প্রধান উপাদান।
- মাটির কণা বলতে প্রধানত কাঁকর, বালির কণা, পলিকণা আর কাদার কণাকে বোঝানো হয়।
- বিভিন্ন ধাতুর অজৈব লবণগুলো হল মাটির অজৈব উপাদান।
- উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের পচা-গলা যেসব অংশ মাটির সঙ্গে মিশে থাকে, তাকে বলে হিউমাস। এই হিউমাস-ই হল মাটির প্রধান জৈব পদার্থ। এছাড়াও মাটিতে মিশে থাকা প্রাণীদের মল, মূত্র প্রভৃতি মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়।
- মাটির আর একটা প্রধান উপাদান হল জল। মাটিতে উপস্থিত জলের প্রধান উৎস হল বৃষ্টির জল।
- মাটির বিভিন্ন ধরনের কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। আর এই বায়ুর মধ্যে থাকে অক্সিজেন গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি।
- মাটির মধ্যে বাস করে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, কেঁচো, উই, পিঁপড়ে, শামুক প্রভৃতি জীব। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শৈবালও মাটিতে দেখা যায়। এরাই হল মাটির সজীব উপাদান।
- মানুষের তৈরী অনেক বস্তু ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। সেগুলো মাটির অস্বাভাবিক উপাদান হিসাবে মাটিতে মিশে থাকে। যেমন - চায়ের ভাঁড়ের টুকরো, লোহার টুকরো, প্লাস্টিকের টুকরো ইত্যাদি।

মাটিতে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ

মাটির কণা

আমাদের কাজ ৪

(৪-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে কাজটা করো)

১. শিক্ষক / শিক্ষিকা প্রতিটি দলকে বেলে, এঁটেল, দোঁয়াশ এই তিন ধরনের মাটির নমুনা A, B এবং C লেবেল লাগিয়ে দেবেন।

২. শিক্ষক / শিক্ষিকার দেওয়া নমুনাগুলোর প্রতিটা থেকে ছোটো ছোটো ইঁট/ পাথরের টুকরো, ঘাস বা অন্যান্য কোনো অস্বাভাবিক উপাদান থাকলে, সেগুলো বেছে বাদ দিয়ে দাও।

৩. মাটির প্রতিটি নমুনাকে অল্প জল দিয়ে এমনভাবে মেখে নাও, যাতে নমুনাগুলো থেকে খুব সহজেই মাটির তাল তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নজর রাখো, মাটির তালগুলি যেন চটচটে না হয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো জল যোগ করে নাও।

৪. প্রতিটা নমুনার তাল থেকে প্রথমে একটা করে বল বানাতে চেষ্টা করো।

৫. এবারে ঐ বলগুলোকে একটা মসৃণ তল যেমন মেঝের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে, ঐ বলগুলো থেকে এক একটা চোঙ বানাও।

৬. আবার ঐ চোঙগুলোকে মেঝের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে এক একটা বলয় বা রিং বানানোর চেষ্টা করো।

৭. মাটির নমুনাগুলোর মধ্যে, কোন্ কোন্‌টা বিভিন্ন ধরনের আকার গড়ার উপযোগী বলে তোমাদের মনে হচ্ছে লেখো।

৮. তোমাদের কী মনে হয়, কোন নমুনাটা দিয়ে সহজেই খেলনা, মূর্তি বা বাসনপত্র বানানো যাবে ? নীচের ছকে লেখো।

সারণী - ৪

নমুনা	বিভিন্ন আকার গড়ার জন্য কতটা উপযোগী	খেলনা, মূর্তি বা বাসনপত্র বানানোর জন্য কতটা উপযোগী	মন্তব্য
A			
B			
C			
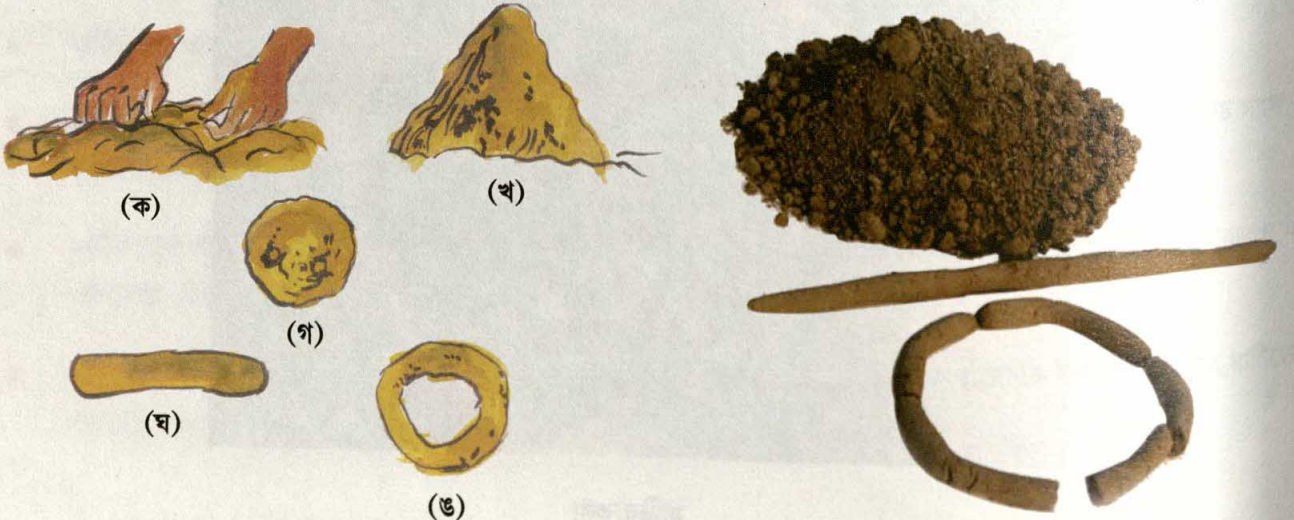
মাটি দিয়ে বিভিন্ন আকার তৈরী করা

মাটির নমুনা আর সেই মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন আকার

আমাদের কাজ ৫

(৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে কাজটা করো)

কী কী লাগবে ঃ

(১) তিন ধরনের মাটির নমুনা (২) তিনটি প্লাস্টিকের বোতল (কোল্ড ড্রিংক্স বা জলের বোতল) (৩) তিনটি কানা উঁচু পাত্র / ৫০০ মিলি বীকার (৪) মাপক চোঙ (Measuring Cylinder) (৫) ঘড়ি / স্টপওয়াচ (৬) স্কেল (৭) স্কেচ পেন (কাঁচের বা প্লাস্টিকের পাত্রের গায়ে যাতে দাগ দেওয়া যায়) (৮) একটা পেরেক।

কী করতে হবে ঃ

১. প্লাস্টিকের বোতল তিনটের ওপর দিকটা কেটে নাও।

২. পেরেক দিয়ে প্রতিটা বোতলের নীচে একটা ফুটো করো।

৩. তিনটে বোতলে তিন ধরনের মাটির নমুনা নাও। প্রতিটা বোতলে সমপরিমাণ মাটি নাও।

৪. প্রতিটা বোতলকে এক একটা কানা উঁচু পাত্র / বীকারের ওপর এমনভাবে বসাও, যাতে প্লাস্টিকের বোতল থেকে জল ঐ কানা উঁচু পাত্রে সহজেই এসে পড়ে।

৫. প্রতিটা কানা উঁচু পাত্র / বীকারের গায়ে, নীচ থেকে ১ ইঞ্চি উচ্চতায় স্কেচ পেন দিয়ে একটা দাগ দিয়ে নাও।

৬. ২৫০ মিলি জল মাপক চোঙে মেপে নাও। (মনে রেখো, তিন ধরনের মাটির নমুনা ভর্তি তিনটে প্লাস্টিকের বোতলেই একই পরিমাণ জল ঢালতে হবে)।

৭. প্রতিটা বোতলে নেওয়া নমুনা মাটিতে আস্তে আস্তে জল ঢালতে আরম্ভ করো। জল ঢালা আরম্ভ করার সময়টা ঘড়িতে দেখো বা স্টপওয়াচ চালু করো।

৮. কিছু সময় যেতে দাও যাতে বোতলে ঢালা জল মাটির মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে নীচের পাত্রে পড়ে।

৯. কতক্ষণে নীচে রাখা পাত্রগুলির ১ ইঞ্চি দাগ পর্যন্ত জলে ভরে গেলো, সেই সময়টা ঘড়ি / স্টপ ওয়াচের সাহায্যে দেখো আর নীচের ছকে লিখে রাখো।

১০. যতক্ষণ না পর্যন্ত নীচের পাত্রে জল পড়া বন্ধ হয়, পরীক্ষাটা চালিয়ে যাও।

১১. ওপরের প্লাস্টিকের বোতল থেকে নীচের পাত্রে জল পড়া বন্ধ হয়ে গেলে নীচের পাত্রগুলো সরিয়ে নাও।

১২. এবারে মাপক চোঙের সাহায্যে প্রতিটা পাত্রে জমা হওয়া মোট জলের পরিমাণ মাপো আর নীচের ছকে লিখে রাখো।

সারণী - ৫

নমুনা	জল ১ ইঞ্চি দাগ পর্যন্ত পৌঁছানোর সময় (১)	পাত্রে / বীকারে জমা মোট জল (মিলি) (২)
A		
B		
C		

১৩. ১ ইঞ্চি দাগ পর্যন্ত পৌঁছতে যে সময়টা লেগেছে, সেই সময়টা দিয়ে ৬০ মিনিটকে ভাগ করে ইঞ্চি/ঘন্টায় অনুস্রবণ হার (percolation rate) বের করো। অনুস্রবণ হার নীচের ছকে লেখো।

(যেমন ঃ যদি ১ ইঞ্চি দাগ পর্যন্ত পৌঁছতে ৫ মিনিট সময় লেগে থাকে, ৫ দিয়ে ৬০ কে ভাগ করো। ভাগফলটাই হলো অনুস্রবণ হার)।

সারণী - ৬

নমুনা	অনুস্রবণ হার (ইঞ্চি/ঘন্টা)
A	
B	
C	

১৪. এবারে প্রথম ছক থেকে লক্ষ্য করে দেখো, তুমি যে ২৫০ মিলি জল প্রতিটি বোতলে ঢেলেছিলে, সেই জল পুরোটা কিন্তু নীচের পাত্রে আসে নি।

১৫. তাহলে এবার কী পরিমাণ জল নীচের পাত্রে আসেনি, সেটা বের করে ফেলো। প্রথমে ছক থেকে 'বীকারে জমা মোট জল' - এর যে পরিমাণ পেয়েছো তাকে ২৫০ মিলি থেকে বিয়োগ করো আর নীচের ছকে লেখো।

সারণী - ৭

নমুনা	মাটি যে পরিমাণ জল ধরে রাখতে পারলো/ মাটির জলধারণ ক্ষমতা (মিলি)
A	
B	
C	

১৬. নমুনা মাটিগুলোর অনুস্রবণ হার আর জলধারণ ক্ষমতা নীচের ছকে লেখো।

সারণী - ৮

নমুনা	অনুস্রবণ হার (ইঞ্চি/ঘন্টা)	জলধারণ ক্ষমতা
A		
B		
C		
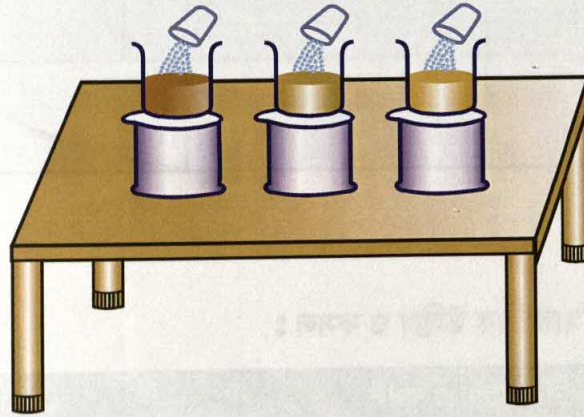
বিভিন্ন ধরনের মাটির অনুস্রবণ হার ও জলধারণ ক্ষমতার পরীক্ষা

- ওপরের কাজ দুটি থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে মাটিকে প্রধানত তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় — বেলে, এঁটেল আর দোঁয়াশ।
- এবারে ভেবে দেখোতো, এর আগে যে দুটো কাজ (আমাদের কাজ - ৪ ও ৫) তোমরা করেছো, সেই কাজগুলোর A, B ও C নমুনাগুলো কোন্ কোন্ ধরনের মাটি বলে তোমার মনে হয়।

বাঁদিক থেকে পরপর — বেলে মাটি, দোঁয়াশ মাটি আর এঁটেল মাটি

আমাদের কাজ ৬

১. তোমরা চারপাশের বিভিন্ন জায়গা যেখানে নানা রকম গাছ/ ফসল আছে, সেখান থেকে পরিমাণ মতো মাটি নিয়ে এসো।

২. এবারে মাটির উপাদানের ওপর ভিত্তি করে তোমাদের আনা মাটির নমুনাগুলোকে চেনার চেষ্টা করো আর নীচের ছকে লেখো।

৩. ঐ মাটিতে কী কী ধরনের গাছ / ফসল ছিলো, সেটাও মনে করে নীচের ছকে লেখো।

কোথাকার মাটি	মাটির নমুনাটার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য	ঐ মাটির নমুনাটা কোন ধরনের বলে তোমার মনে হয়	ঐ মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদ কী কী ধরনের	ঐ মাটিতে জন্মানো ফসল কী কী ধরনের

সারণী - ৯

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মানো স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও ফসল ঃ

মাটির প্রকার	স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও ফসল
বেলে	ভালো জল পেলে শসা, ফুটি, তরমুজ, পটল, কুমড়ো ইত্যাদি
এঁটেল	আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি সার দিলে ধান, গম ইত্যাদি ভালো হয়
দোঁয়াশ	ধান, গম, আলু, ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি
কাঁকর	ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ
লাল	তুলো, চীনেবাদাম, কাজুবাদাম ইত্যাদি
লোনা	সুন্দরী, গরাণ, তাল, নারকেল, আমন ধান, তুলো, আখ ইত্যাদি
হিউমাস	মস, ফার্ণ, অর্কিড, চা ইত্যাদি

আমাদের কাজ ৭

১. শিক্ষক/ শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো মাঠে নিয়ে যাবেন।

২. মাঠের যে অংশে কোনো ঘাস নেই আর তার পাশাপাশি যে অংশে ঘাস আছে - এই দুই জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করো।

৩. মাঠে বসেই ঐ দুই ধরনের মাটির নমুনাগুলো ভালোভাবে দেখো, তাদের মিল / অমিলগুলো লেখো।

সারণী - ১০

মাঠে ঘাস আছে, এমন জায়গার মাটির বৈশিষ্ট্য	মাঠে ঘাস নেই, এমন জায়গার মাটির বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
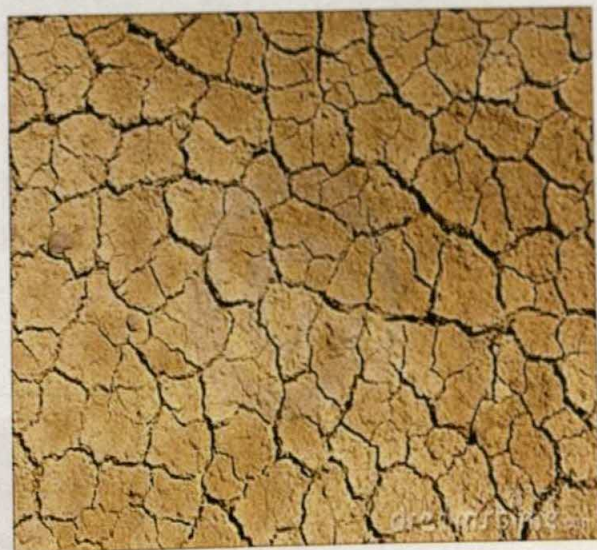
ঘাসে ঢাকা এবং ঘাসবিহীন মাটি

মাটির ব্যবহার ও সংরক্ষণ ঃ

ব্যবহার ঃ

- তোমরা তো প্রথমেই জেনেছো যে মাটি নানা ধরনের প্রাণীর বাস করার জায়গা।
- আবার এটাও তোমরা জানো যে মাটি না থাকলে বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মাতো না। চাষের সাহায্যে বিভিন্ন ফসল ফলানোর জন্যও মাটি একান্তই প্রয়োজন।
- এছাড়াও মাটি আমাদের নানা কাজে লাগে। যেমন গ্রামে মাটি দিয়ে বাড়ি তৈরী হয়।
- আবার শহরে বাড়ী তৈরী করতে প্রধানত কী লাগে বলোতো ? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো - ইঁট। কিন্তু এই ইঁট কী দিয়ে তৈরী হয় জানো কী ? মাটি দিয়ে। প্রথমে কাঁচা মাটি দিয়ে ইঁট তৈরী করা হয়। তারপর ইঁটভাটায় সেই কাঁচা ইঁট পুড়িয়ে পাকা ইঁট তৈরী করা হয়।

কাঁচা ইঁট
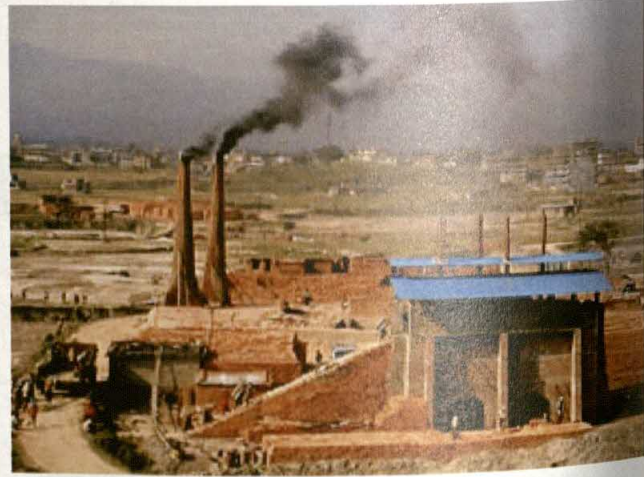
ইঁটভাটা

পাকা ইঁট

- মাটি দিয়ে নানারকম থালা, গ্লাস, বাটি, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি তৈরী হয়।
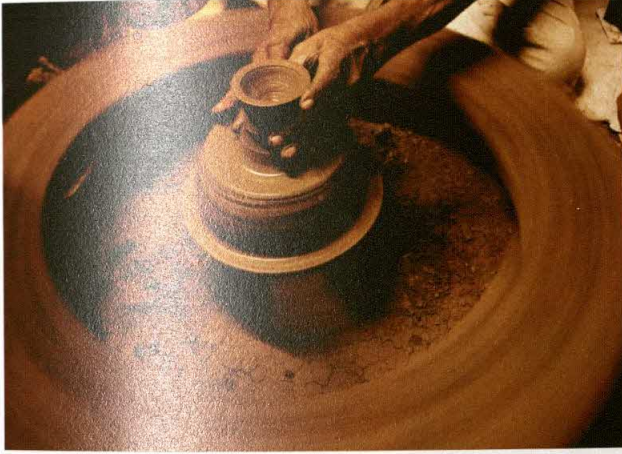
কুমোরের চাকা (Potter's Wheel)-য় কলসী তৈরী হচ্ছে

তৈরী হওয়া কলসী

- মাটি দিয়ে নানা ধরনের পুতুলও তৈরী করা হয়।
- ঠাকুর দেবতার মূর্তিও মাটি দিয়েই বানানো হয়।

সংরক্ষণ

- মাটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে মাটির ক্ষয় হয়।
- এর আগে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তোমরা নিজেরাই দেখেছো যে, উদ্ভিদ তার মূল দিয়ে মাটির কণাগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখে, মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায়।

মাটির ক্ষয়

মাটির ক্ষয়

- পাহাড়ী জায়গায় পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে মাটির ক্ষয় বন্ধ করা যায়। ঐ ধাপগুলোতে চাষের কাজ করলে মাটির ক্ষয় বন্ধ হয়।

পাহাড়ে ধাপ চাষ

- সরাসরি মাটির ক্ষয় না হয়ে আবার অন্যভাবেও মাটির ক্ষয় হতে পারে। মাটির যে গুণের জন্য মাটিতে উদ্ভিদ ভালোভাবে জন্মায় সেটা হলো **মাটির উর্বরতা**। মাটিতে বার বার একই ধরনের ফসলের চাষ করলে মাটির উর্বরতা কমে যায়।
- মাটিতে ফসল ফলানোর আগে, মাটিকে ভালোভাবে লাঙ্গল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা হয়। এর ফলে ওপরের মাটি নীচে আর নীচের মাটি ওপরে উঠে আসে। মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা আর বায়ু চলাচল বেড়ে যায়। এক কথায়, মাটির উর্বরতা বাড়ে।

- একই জমিতে প্রতি বছর একই রকম ফসল না ফলিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকম ফসল ফলালে জমির উর্বরতা স্বাভাবিক থাকে।
- চাষের জমি থেকে আগাছা সরিয়ে দিয়েও জমির উর্বরতা রক্ষা করা যায়।

মাটির উর্বরতা বাড়াতে জীবের ভূমিকা ঃ

- **কেঁচো** ওপরের মাটি নীচে আর নীচের মাটি ওপরে এনে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা আর বায়ু চলাচল বাড়ায়। অর্থাৎ কেঁচো, লাঙ্গল বা ট্রাক্টরের মতো মাটির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে । তাই কেঁচোকে **স্বাভাবিক কর্ষক** বলা হয়।

কেঁচো

- **কেঁচো** ছাড়াও পিঁপড়ে, উই, ইঁদুর ইত্যাদি মাটিতে বাস করে। এমন প্রাণী মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বা বাসা বানিয়ে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা আর বায়ু চলাচল বাড়ায়।
- এছাড়াও, খালি চোখে দেখা যায় না এমন অনেক জীব মাটিতে বাস করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস নিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে।

আমরা যা শিখলাম

- ভূপৃষ্ঠ যে আলগা আবরণে ঢাকা থাকে এবং যার ওপর গাছপালা জন্মায় ও মানুষ চাষ-আবাদ করে, তাকে মৃত্তিকা বা **মাটি** বলে।
- মাটি প্রধানত তিন ধরনের — বেলে, এঁটেল ও দোঁয়াশ।
- দোঁয়াশ মাটিতে ফসল ভালো হয়।
- মাটি দিয়ে থালা, গ্লাস, বাটি, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি তৈরী হয়।
- গ্রামে মাটি দিয়ে বাড়ি তৈরী হয়। আবার মাটি দিয়ে ইঁটও তৈরী হয়। এই ইঁট দিয়েই পাকা বাড়ি তৈরী করা হয়।
- মাটিতে গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয় এড়ানো যায়।
- মাটির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে — কেঁচো, উই, পিঁপড়ে ইত্যাদি প্রাণী।

নিজে করে দেখো ঃ

১) i) তোমার বাড়ি বা বিদ্যালয়ের কাছাকাছি যে কোনো দুটো জায়গা থেকে মাটি নিয়ে এসো।

ii) তোমার আনা নমুনা মাটিতে কোনো অস্বাভাবিক উপাদান আছে কী না দেখো এবং একটা ছকে লিপিবদ্ধ করো।

iii) ঐ অস্বাভাবিক উপাদানগুলো কী কী কারণে মাটিতে মিশে থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়, সেটাও ঐ ছকে লেখো।

২) i) ১০০ গ্রাম মাটি নাও (প্রয়োজনে কাছাকাছি কোনো দোকান থেকে ওজন করে নাও)। ঐ মাটিটাকে খবরের কাগজের ওপর রেখে কম করে ঘন্টা দুয়েক রোদে শুকিয়ে নাও।

ii) এবারে রোদ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঐ মাটিটাকে আবার ওজন করো।

iii) প্রথমবারের ওজন আর শেষবারের ওজনে যে পার্থক্য পেলে সেটাই হল ঐ ১০০ গ্রাম মাটির **আর্দ্রতা** (মাটির জলীয় ভাগ)-র পরিমাণ - একে **আর্দ্রতার শতকরা হার** বলা হয়।

iv) নীচে দেওয়া সূত্রটা ব্যবহার করে আর্দ্রতার শতকরা হার বের করো।

$$\text{মাটির আর্দ্রতার শতকরা হার} = \frac{\text{মাটির জলীয় ভাগের পরিমাণ (গ্রাম)}}{\text{মাটির নমুনার প্রাথমিক ওজন (গ্রাম)}} \times ১০০$$

[ধরো, তোমার আনা মাটির নমুনাটা শুকিয়ে যাওয়ার পর ওজন করে দেখলে যে নমুনাটার ওজন ১০ গ্রাম কমে গেছে।

তাহলে নমুনা মাটির আর্দ্রতার শতকরা হার $= \frac{১০}{১০০} \times ১০০ = ১০\%$]

৩) i) তোমার বাড়ি বা বিদ্যালয়ের কাছাকাছি যে কোনো তিনটে জায়গা থেকে মাটির নমুনা জোগাড় করে আনো।

ii) এবারে, আমাদের কাজ ৫ অনুযায়ী ঐ তিনটে মাটির নমুনার জলধারণ ক্ষমতা আর অনুস্রবণ হার বের করো।

iii) তিনটে মাটির নমুনার জলধারণ ক্ষমতা আর অনুস্রবণ হার বার ডায়াগ্রাম (Bar Diagram)-র সাহায্যে প্রকাশ করো।

[ধরো তিনটে মাটির নমুনা A, B ও C-র জলধারণ ক্ষমতা হল এইরকম —

A — ১০ মিলি

B — ২০ মিলি

C — ৩০ মিলি
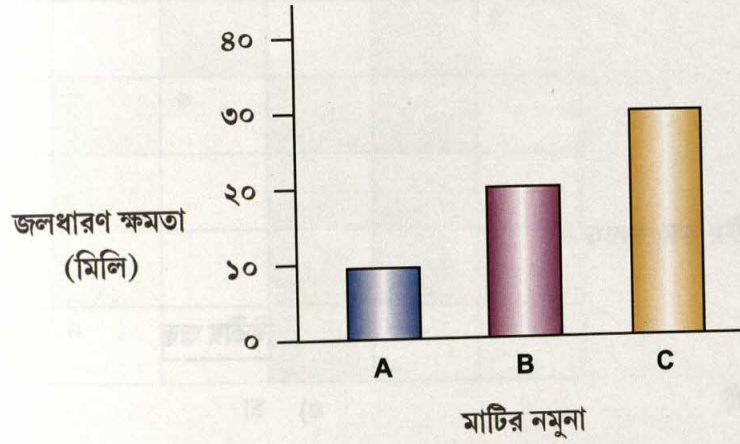
[প্রতি ১০ মিলি-র জন্য ১ সেমি উচ্চতার স্তম্ভ আঁকো। একইভাবে, ২০ মিলি-র জন্য ২ সেমি উচ্চতার স্তম্ভ আঁকো। আবার ৩০ মিলি-র জন্য ৩ সেমি উচ্চতার স্তম্ভ আঁকো।

একইভাবে তিনটে নমুনার অনুস্রবণ হারের একটা বার ডায়াগ্রাম (Bar Diagram) আঁকো।]

অনুশীলনী

১) ইঁট যেখানে তৈরি হয় তাকে কী বলে ?

২) পাহাড়ী জায়গায় মাটির ক্ষয় বন্ধ করা যায় কীভাবে ?

৩) যে মাটির জলধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী সেটা হল —

i) এঁটেল মাটি

ii) বেলে মাটি

iii) লাল মাটি

iv) দোঁয়াশ মাটি

৪) প্রথম স্তম্ভের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভ মেলাও —

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
i) বেলে মাটি	a) চা
ii) কেঁচো	b) তুলো
iii) লোনা মাটি	c) জলধারণ ক্ষমতা কম
iv) হিউমাস মাটি	d) স্বাভাবিক কর্ষক
v) লাল মাটি	e) নুনের পরিমাণ বেশী

৫) মাটির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে এমন দুটো প্রাণীর নাম লেখো।

৬) মাটির অজৈব উপাদান হল বিভিন্ন ধাতুর ------------------- লবণ।

৭) সূত্র অনুযায়ী নীচের শব্দছকটা ভর্তি করো।

১		২			৩		
৪							৫
				৬			
৭							
৮			৯			১০	

ওপর-নীচ

১) চাষীর বন্ধু

২) কুমোরের পছন্দের মাটি

৩) এখানে ইঁট তৈরী হয়

৪) মাটির জলের উৎস

৫) মাটিতে থাকে এই গ্যাস, যা জীবের বেঁচে থাকার জন্য খুবই দরকার

৬) এই ফসল লাল মাটিতে ভালো হয়, লেপের মধ্যেও থাকে।

পাশাপশি

৩) মাটির জীব, বাড়িতেও দেখা যায়।

৪) এই মাটিতে চা ভালো হয়।

৮) এই মাটিতে সুন্দরী গাছ ভালো হয়।

৯) সার দিলে এঁটেল মাটিতে এই ফসল ভলো হয়, এই ফসল থেকেই বাঙালীর প্রধান খাদ্য তৈরী হয়।

১০) দোঁয়াশ মাটিতে এই ফসল ভালো হয়, ভাতের সঙ্গে খাও।

শক্তি

আমাদের কাজ

তোমরা সূর্যের আলো ও তাপকে যে যে কাজে ব্যবহার করতে দেখেছ তা নীচের সারণীতে লেখো।

সারণী - ১

	সূর্যের আলো ও তাপের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার							
কাজের পরিচয়								

১. সূর্যের আলোয় বই পড়া

২. বালতিতে জল গরম করা

৩. রোদে জামাকাপড় শুকনো করা

৪. বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু প্রভৃতি কেটে রোদে শুকনো করা

আমাদের কাজ ২

তোমরা ১-নং সারণীতে যে যে কাজের উল্লেখ করেছ তার মধ্যে যে যে কাজে সূর্যের আলো ব্যবহৃত হয় এবং যে যে কাজে সূর্যের তাপ ব্যবহৃত হয় তার দুটি আলাদা সারণী প্রস্তুত করো।

সারণী - ২

সূর্যের আলোর ব্যবহার	
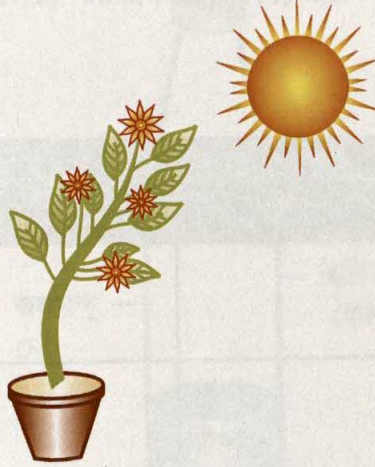
সূর্যের আলোয় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরী করে।

সৌরকোশের সাহায্যে আজকাল বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি এমন দুর্গম অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সারণী - ৩

সূর্যের তাপের ব্যবহার	

সোলার হিটার এবং সোলার কুকার

আমাদের কাজ ৩

একটি জুতোর বাক্স নিয়ে তার উপরের ঢাকনায় একপাশে গোল করে কেটে নেওয়া হল। এবার একটি ছোট টবে একটি চারাগাছ নিয়ে টবটিকে ঐ বাক্সের মধ্যে যেদিকের ঢাকনা কাটা হয়নি সেদিকে রাখা হল। এরপর চারাগাছ সুদ্ধ বাক্সটিকে সবসময় রোদ লাগে এমন স্থানে রাখা হল। টবের মাটিতে নিয়মিত জল দিতে হবে। কিছুদিন রাখার পর কী কী পর্যবেক্ষণ করলে তা নীচের সারণীতে লেখো।

সারণী - ৪

শিক্ষার্থীর নাম ঃ	শ্রেণি ও বিভাগ ঃ	দলের নাম ঃ
কাজের বিবরণ ঃ ও চিত্র		
তুমি কী দেখলে — শুরুর দিন (তাং -) ঃ একদিন পর (তাং -) ঃ দুদিন পর (তাং -) ঃ পাঁচদিন পর (তাং -) ঃ		
এর থেকে তুমি কী শিখলে ঃ		
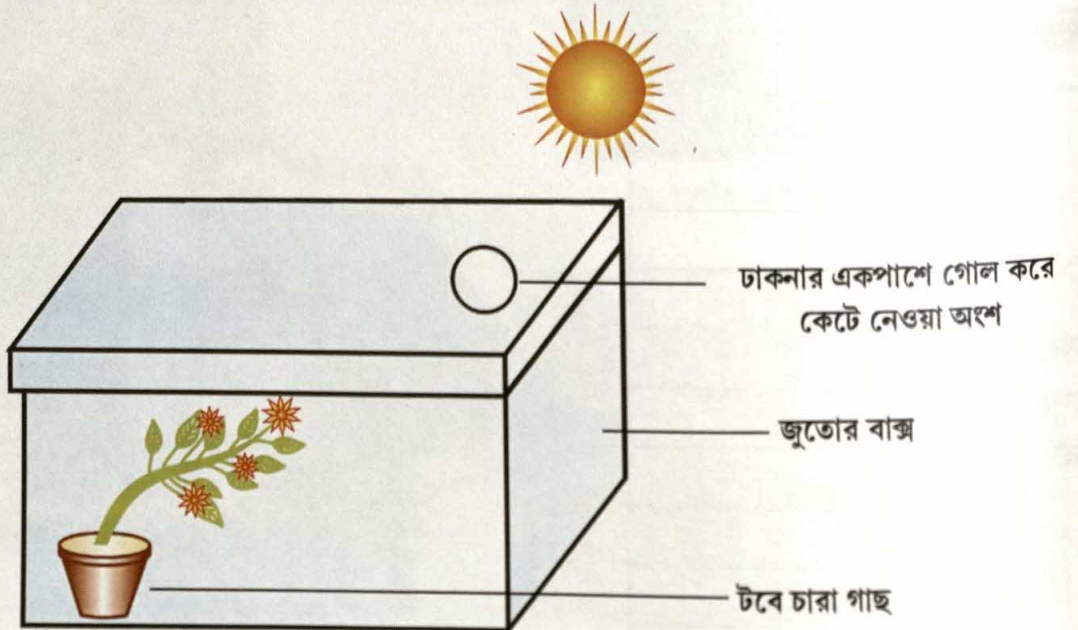
সবুজ উদ্ভিদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য সূর্যের আলো প্রয়োজন

আমাদের কাজ ৪

একটি পরিষ্কার, শুকনো কাচের বা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ বোতল জোগাড় করো। বোতলটিতে সামান্য পরিমাণ জল ভরে ছিপি বন্ধ করো। এরপর লক্ষ্য করে দেখ যে বোতলটির উপরের দিকে ভিতরের গায়ে কোন জলবিন্দু লেগে আছে কী না। এরপর জলসুদ্ধ বোতলটিকে খোলা জায়গায় রোদে রাখো। আধঘন্টা পরে আবার বোতলটির উপরের দিকে ভিতরের গায়ে জলবিন্দু জমেছে কী না তা লক্ষ্য করো। নীচে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে কাজের বিবরণ ও তুমি কী দেখলে তা লেখো। পরীক্ষা শুরুর মুহূর্তে ও শেষে যা দেখলে তার চিত্র অঙ্কন করো।

সূর্যের তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়

সারণী - ৫

শিক্ষার্থীর নাম ঃ	শ্রেণি ও বিভাগ ঃ	দলের নাম ঃ	তাং ঃ
এই কাজটিতে কী কী উপকরণ লেগেছে ঃ			
কাজের বিবরণ ঃ			
তুমি কী দেখলে তা লেখো ও ছবি আঁকো — কাজটি শুরুর মুহূর্তে ঃ আধঘন্টা পরে ঃ			
এর থেকে তুমি কী শিখলে ঃ			

আমাদের কাজ ৫

তোমরা তো সূর্যের আলোর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় সেকথা জেনেছো। এবার কোন কোন উপায়ে বিদ্যুৎ তৈরী করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

সারণী - ৬

শিক্ষার্থীর নাম ঃ	বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি	শ্রেণি ও বিভাগ ঃ	দলের নাম ঃ	তাং ঃ
কাজের পরিচয়				
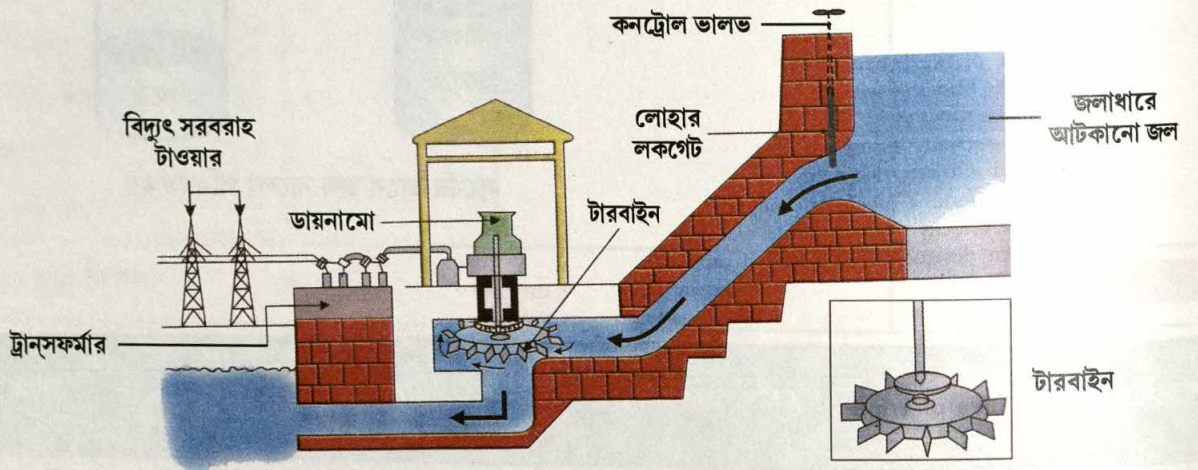
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

সূর্যের আলোয় সৌরকোশের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন
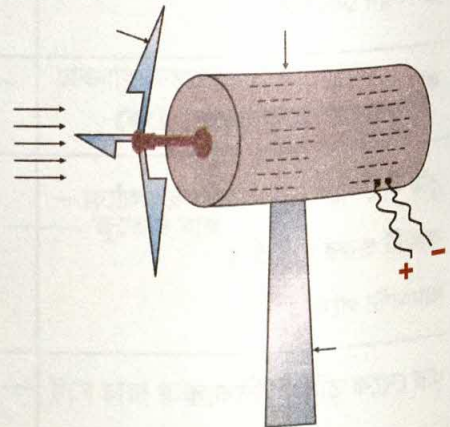
হাওয়াকলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন

আমাদের কাজ ৬

তোমরা নীচের চার্টটিকে সুন্দর করে আঁকো। এই চার্ট থেকে তোমরা কী শিখলে তা লেখো।

উৎপাদন	প্রক্রিয়া		প্রবাহ
পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন	পরমাণু থেকে প্রাপ্ত প্রচন্ড তাপ	এই তাপে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরী করা হল	বাষ্প প্রবাহ
তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন	কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরী করা হল		বাষ্প প্রবাহ
বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন	বায়ুর সাহায্যে বায়ু কল ঘোরানো হল		বায়ু প্রবাহ
জল বিদ্যুৎ উৎপাদন	ঝর্ণার জল		জল প্রবাহ
জল বিদ্যুৎ উৎপাদন	নদীতে জোয়ার ভাটা		জল প্রবাহ
জল বিদ্যুৎ উৎপাদন	নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখা হল		জল প্রবাহ
	ডিজেল বা পেট্রল পুড়িয়ে ইঞ্জিন চালানো হল		

টারবাইন → ডায়নামো → উৎপাদিত বিদ্যুৎ → বৈদ্যুতিক বাতি
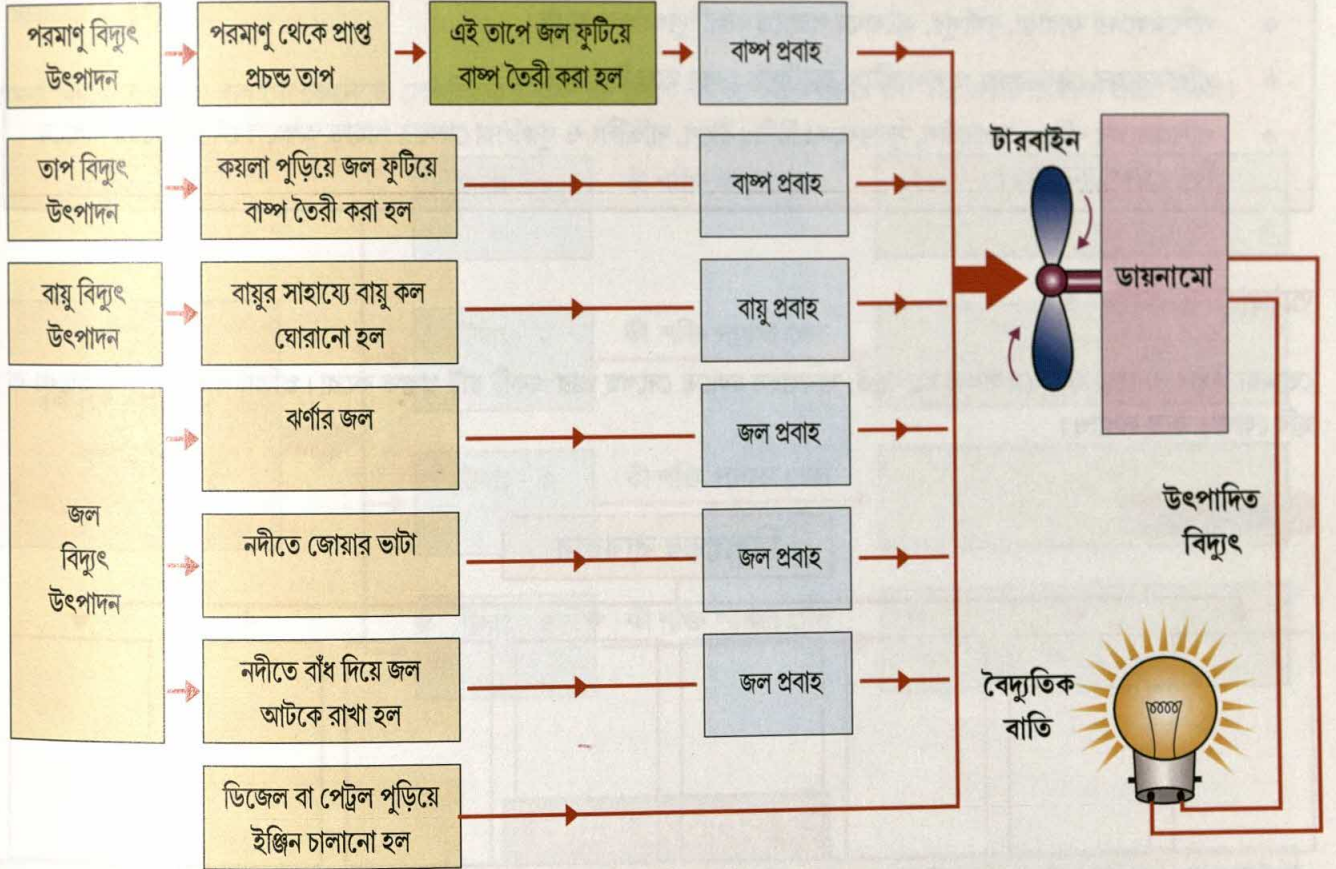
বিভিন্নভাবে টারবাইনযুক্ত ডায়নামো ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়

সারণী - ৭

উপরের চার্ট থেকে তুমি কী শিখলে	ছাত্র/ছাত্রীর নাম	শ্রেণী ও বিভাগ	দলের নাম	তাং

তোমরা জানো কি ?

- পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালডিহি, মেজিয়া, ব্যান্ডেল, কোলাঘাট প্রভৃতি স্থানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।
- পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা, দুর্গাপুর, অযোধ্যা পাহাড়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।
- পশ্চিমবঙ্গের ফ্রেজারগঞ্জ ও সাগরদ্বীপে বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।
- পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, সাগরদ্বীপ, সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে, দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলার পাহাড় অঞ্চলে সৌরকোষের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

আমাদের কাজ ৭

তোমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যে সকল যন্ত্রপাতি, যানবাহন চলতে দেখেছ তার একটি চার্ট প্রস্তুত করো। প্রতিটির পাশে ছবি আঁকো বা ছবি যোগাড় করে লাগাও।

সারণী - ৮

আমাদের কাজ ৮

সারণী - ৯

তোমরা বিদ্যুতের যে যে ব্যবহার জেনেছো সেগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি থেকে কী কী শক্তি পাওয়া যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
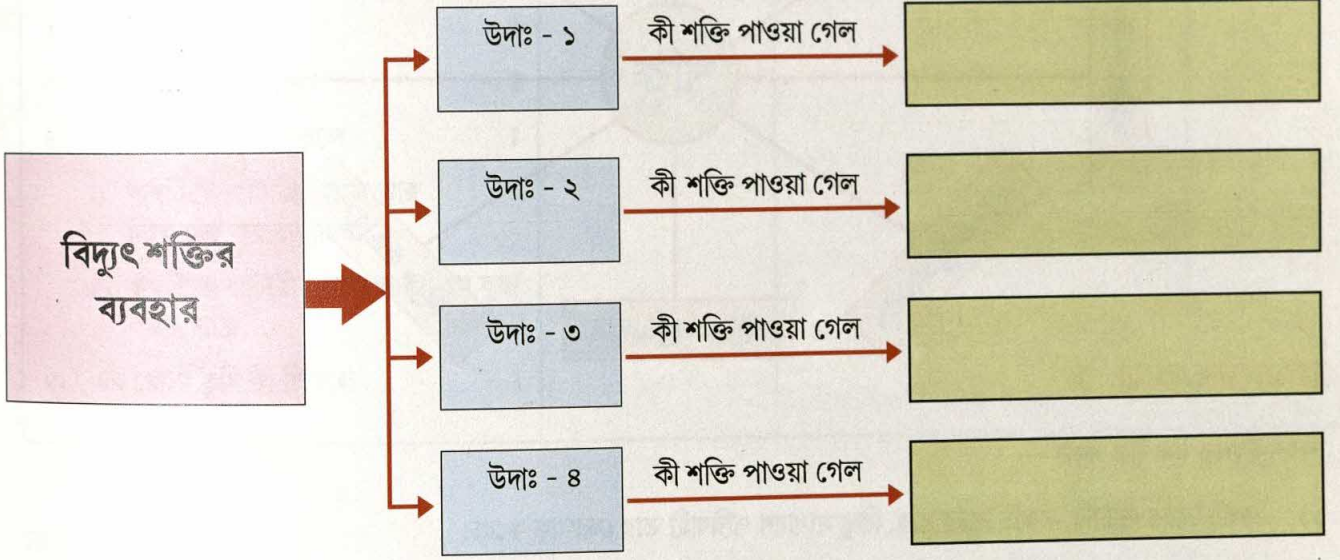
তোমরা জানো কি ?

যত ধরনের শক্তি পাওয়া যায় সেগুলিকে মোট আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল — যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি, তড়িৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি। আর এই শক্তিগুলিকে একরূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায়।

আমাদের কাজ ৯

শিক্ষার্থীদের করণীয় কাজ —

১) একটি টর্চের ব্যাটারি, একটি টর্চের বাল্ব, কিছু সাধারণ পরিবাহী তার জোগাড় করো।

২) তারের টুকরোগুলির দুই প্রান্তের আবরণ কেটে ভিতরের তামার তার বের করো।

৩) এরপর নীচের ছবির মত করে বাল্ব ও ব্যাটারীর মধ্যে তারের সাহায্যে সংযোগ স্থাপন করো।

৪) তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে তা লেখো।
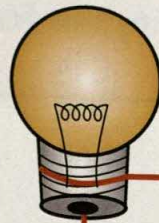
বিদ্যুৎশক্তি থেকে আলোকশক্তি ও
তাপশক্তি পাওয়া যাচ্ছে

সারণী - ১০

শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি ও বিভাগ	দলের নাম	তাং
১. এই কাজটিতে কী কী উপকরণ লেগেছে ঃ ২. কাজের বিবরণ ঃ ৩. প্রয়োজনীয় ছবি আঁকো ঃ ৪. তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে ঃ i) বাল্বটিকে ব্যাটারীর সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত করার আগে ii) বাল্বটিকে ব্যাটারীর সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত করার পরে ৫. এর থেকে তুমি কী শিখলে ঃ			

আমাদের কাজ ১০

১) একটি পুরোনো পোস্টকার্ড বা শক্ত কার্ডকে কেটে ছবির মত সুতো বেঁধে একটি দোলনা তৈরী করো।

২) দোলনাটির চারকোণের সুতোগুলিকে ছবির মত এক জায়গায় বেঁধে সেখানে একটুকরো পাকহীন নাইলন সুতো বাঁধ।

৩) একটি দন্ডচুম্বককে দোলনাটির উপর রেখে নাইলন সুতো ধরে ঝোলাও। দেখ যে চুম্বকটি কোন দিকে মুখ করে আছে।

৪) এবার দোলনাটিকে পুরো একপাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দাও।

৫) দোলনাটি থামার পর দেখ যে চুম্বকটি কোন দিক বরাবর মুখ করে আছে।

৬) পরীক্ষা পদ্ধতি ও তোমার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করো।
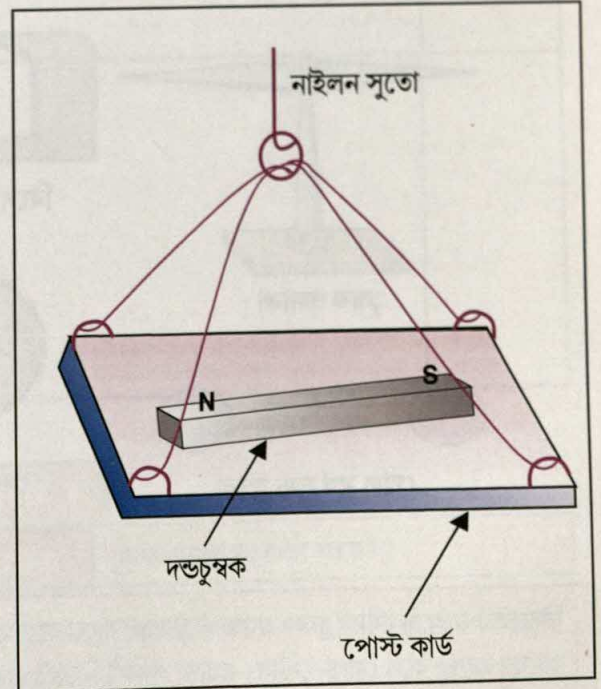
সারণী - ১১

শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি ও বিভাগ	দলের নাম	তাং
১. কাজটি করতে তোমার কী কী উপকরণ লেগেছে : ২. কাজের বিবরণ : ৩. প্রয়োজনীয় ছবি আঁকো : ৪. তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে : i) চুম্বকটিকে ঘুরিয়ে দেবার পূর্বে : ii) চুম্বটিকে ঘোরানোর পরে : ৫. এর থেকে তুমি কী শিখলে :			

বিভিন্ন আকৃতির চুম্বক

দন্ড চুম্বক
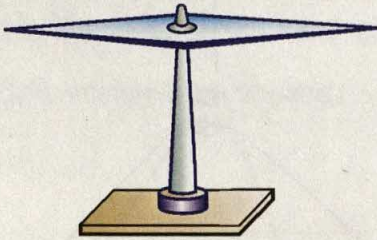
অশ্ব ক্ষুরাকৃতি চুম্বক

বিশেষ আকৃতির চুম্বক

চুম্বক শলাকা

গোল মুখ যুক্ত চুম্বক
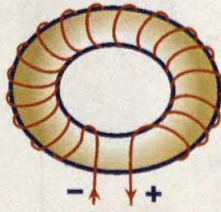
মেরু বিহীন চুম্বক
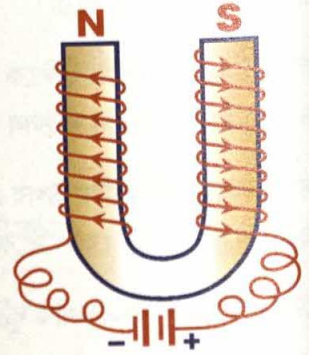
U আকৃতির তড়িৎ চুম্বক

তোমরা জানো কি ?

বিদ্যুতের সাহয্যে যেমন চুম্বক প্রস্তুত করা যায়, যাকে বলে তড়িৎ চুম্বক, তেমনই প্রকৃতিতে কিছু কিছু পাথরের মধ্যে এই ধর্ম আছে। এদের বলে লোড-স্টোন। এছাড়া পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট বড় চুম্বক।

আমাদের কাজ ১১

১) কিছু পরিষ্কার শুকনো বালি জোগাড় করো।

২) কিছু গুঁড়ো লোহা বা লোহার কয়েকটি ছোট আলপিন জোগাড় করো।

৩) একটি বড় কাগজের উপর বালি ও লোহার গুঁড়ো বা আলপিন নিয়ে ভালো করে মেশাও।

৪) এবার একটি শক্তিশালী দন্ড-চুম্বক নিয়ে সেটিকে এই মিশ্রণের কাছে ধরো।

৫) পরীক্ষার বিবরণ ও তোমার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করো ও প্রয়োজনীয় ছবি আঁকো।
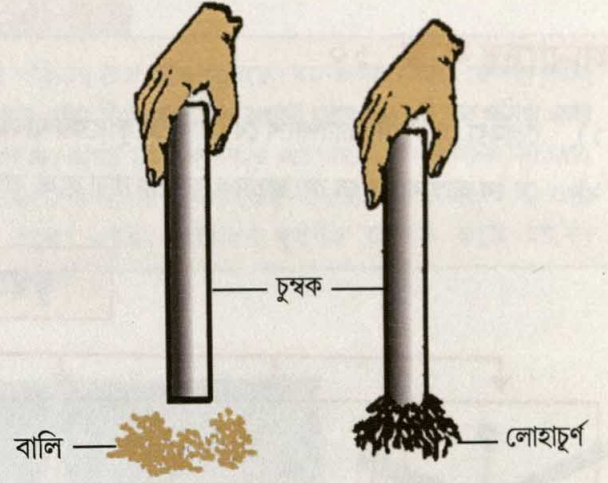
চুম্বক লোহাচূর্ণকে আকর্ষণ করে, বালিকে করে না

সারণী - ১২

শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি ও বিভাগ	দলের নাম	তাং
১. এই কাজটিতে কী কী উপকরণ লেগেছে : ২. কাজের বিবরণ : ৩. প্রয়োজনীয় ছবি আঁকো : ৪. তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে : ৫. এর থেকে তুমি কী শিখলে :			

তোমরা জানো কি ?

চুম্বক এদের আকর্ষণ করে	চুম্বক এদের আকর্ষণ করে না
লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট। এদের বলে চৌম্বক পদার্থ।	কাঠ, কাচ, তামা, পিতল, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক, পাথর। এদের বলে অচৌম্বক পদার্থ।

আমাদের কাজ ১২

১) তোমরা তোমাদের চারপাশে যে যে কাজে চুম্বকের ব্যবহার হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২) যে যে যন্ত্রে বা যে যে কাজে চুম্বক ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের ছবি সংগ্রহ করে আটকাও।

আমাদের কাজ ১৩

১) একটি বড় সাদা কাগজে বা আর্টপেপারে সূর্য থেকে শক্তির প্রবাহ ও তার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কাজের চার্টটি সুন্দর করে আঁক। রঙিন স্কেচপেন ব্যবহার করো।

২) প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন ধরনের ছবি জোগাড় করে আটকাও।

৩) এর থেকে তোমরা যা শিখলে সেই অনুসারে এই চার্টটির একটি নামকরণ করো।

তোমরা জানো কি ?

কোন প্রাণী বা বস্তু বা বস্তুসংস্থার কাজ করার সামর্থ্যকে বলে তার শক্তি। এই শক্তিকে জুল, আর্গ, ক্যালরী, কিলোওয়াট-ঘন্টা, ইলেকট্রন-ভোল্ট প্রভৃতি বিভিন্ন একককে পরিমাপ করা হয়। কোন কাজ করতে গেলে প্রয়োজন হয় শক্তির। সব ধরনের শক্তির মূল উৎস হল সূর্য। যে কোন ধরনের শক্তিই বিভিন্ন রূপান্তরের পর শেষে তাপশক্তিতে পরিণত হয়। মানব সভ্যতার অগ্রগতির পিছনে এই বিভিন্ন ধরনের শক্তির ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব অপরিসীম।

তোমরা জানো কি ?

কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি খনিজ শক্তি উৎসগুলির পরিমাণ দ্রুত কমে আসছে। বন-জঙ্গল কেটে ফেলার ফলে সবুজ উদ্ভিদের পরিমাণও দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে শক্তির সংকট। তাছাড়া এই সব খনিজ এবং উদ্ভিদজাত জ্বালানী পোড়ানোর ফলে পরিবেশ বিপুলভাবে দূষিত হচ্ছে। অথচ মানবসভ্যতার অগ্রগতির জন্য শক্তির সরবরাহ অপরিহার্য। তাই আমাদের সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলপ্রবাহের শক্তি প্রভৃতিকে আরও অনেক বেশী করে ব্যবহার করতে হবে। আর শক্তির অপচয় কমিয়ে প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবহার করতে হবে। এতে পরিবেশ দূষণও অনেক কমে যাবে।

সূর্য থেকে শক্তি প্রবাহ —

সবুজ উদ্ভিদ

কয়লা

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বৈদ্যুতিক পাখা

শক্তি উৎসের বিভিন্ন ব্যবহার —

ডিজেল চালিত ট্রাক্টর

কৃষিজমিতে পাম্প দিয়ে সেচ কার্য

ডিজেল চালিত রেল ইঞ্জিন

কেরোসিন স্টোভে রান্না করা

কেরোসিন বাতি

শক্তি উৎসের ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ—

কলকারখানার ধোঁয়ার দূষণ

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে নির্গত ফ্লাই অ্যাশ মিশ্রিত ধোঁয়ার দূষণ

আমরা যা শিখলাম

- সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলোয় খাদ্য তৈরী করে যা তার ও সকল জীবের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।
- সৌরকোশের দ্বারা সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।
- সৌরবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, জৈবভর থেকে বিদ্যুৎ, ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ, পরমাণু বিদ্যুৎ, প্রভৃতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি।
- পরমাণু বিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, নদীর জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ, ডায়নামো বা জেনারেটারের দ্বারা বিদ্যুৎ - প্রভৃতি প্রতিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে টারবাইনযুক্ত ডায়নামো ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।
- বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, মোটর, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটার, রেডিও, টেলিভিশান, বৈদ্যুতিক কলিংবেল, বৈদ্যুতিক ঘড়ি, চলভাষ, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি বিদ্যুতের সাহায্যে চলে।
- শক্তির আটটি প্রকার ভেদ হল - যান্ত্রিক শক্তি, আলোক শক্তি, তাপশক্তি, রাসায়নিকশক্তি, চৌম্বকশক্তি, শব্দশক্তি, তড়িৎশক্তি, পারমাণবিক শক্তি।
- শক্তির এক রূপকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায়। যেমন - বৈদ্যুতিক কলিংবেলে বিদ্যুৎশক্তিকে শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।
- চুম্বক সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে।
- লোডস্টোন হল একপ্রকারের প্রাকৃতিক চুম্বক। এছাড়া, পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল বড় চুম্বক।
- লোহা, নিকেল, ইস্পাত, কোবাল্ট প্রভৃতি চৌম্বক পদার্থ এবং ইঁট, কাঠ, পাথর, প্লাস্টিক, কাগজ প্রভৃতি অচৌম্বক পদার্থ। চৌম্বক পদার্থগুলি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অচৌম্বক পদার্থগুলি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।
- কোন প্রাণী বা বস্তু বা বস্তুসংস্থার কাজ করার সামর্থকে বলা হয় শক্তি।
- জুল, আর্গ, ক্যালরী, কিলোওয়াট-ঘন্টা, ইলেকট্রন-ভোল্ট প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন একক।
- সূর্যই সকল শক্তির উৎস। সূর্যের শক্তিই বিভিন্নভাবে নানা শক্তি উৎসে সঞ্চিত হয়।
- কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি শক্তি উৎসগুলির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং ব্যাপক বন-জঙ্গল কেটে ফেলায় পৃথিবী জুড়ে শক্তির সংকট দেখা দিয়েছে।
- বিভিন্ন খনিজ শক্তি উৎসের ব্যবহার এবং বন-জঙ্গল কেটে ফেলায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এর থেকে মুক্তির উপায় হল, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলপ্রবাহের শক্তি প্রভৃতি দূষণমুক্ত উৎসগুলির আরো বেশী ব্যবহার।

নিজে করে দেখো

১) একটি এক টাকার কয়েন, একটি লোহার পেরেক, একটুকরো কাগজ, একটি কাঠের টুকরো, একটি পাথরের নুড়ি, একখণ্ড প্লাস্টিক, ছোট কাচের টুকরো, একটি লোহার চাবি জোগাড় করো। এবার একটি দণ্ডচুম্বকের সাহায্যে পরীক্ষা করে কোনগুলি চৌম্বক পদার্থ ও কোনগুলি অচৌম্বক পদার্থ তা নির্ণয় করো। আলাদা তালিকাতে সেগুলি লেখো।

২) একটি কাচের বোতল নিয়ে তার বাইরের গায়ে কালো রঙ করে শুকিয়ে নাও। এবার সেই বোতলে জল ভরে সূর্যের আলোয় রেখে দাও। একঘন্টা পরে বোতলের ঢাকনা খুলে জলে হাত দিয়ে দেখ গরম হয়েছে কী না। পরীক্ষা পদ্ধতির বিবরণ লেখো ও তোমার পর্যবেক্ষণটিও লেখো । প্রয়োজনীয় ছবি আঁক। জল গরম হওয়ার / না হওয়ার কারণটি লেখো।

৩) কয়েকটি ছোট ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট নাও। যে ধরনের প্যাকেটে পানের মশলা দেওয়া হয় সেধরনের প্যাকেট হলে ভালো হয়। এবার বিভিন্ন ধরনের জ্বালানির নমুনা, যেমন — প্যাকাটি, খড়, কয়লা, কেরোসিন, ডিজেল, কাঠ পেট্রোল প্রভৃতি সংগ্রহ করে আলাদা আলাদা প্যাকেটে ভরে প্যাকেটের মুখ আটকাও। এবার প্যাকেটগুলি কোন মোটা, শক্ত কাগজের উপর আটকাও। প্রতিটি প্যাকেটের নীচে সেই জ্বালানীর নাম লেখো। সম্পূর্ণ সংগ্রহটির নামকরণ করো — 'বিভিন্ন ধরনের জ্বালানীর নমুনা'।

৪) রান্না করার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের উনুন পাওয়া যায় সেগুলির ছবি আঁকো কোন উনুনে কী জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তা ছবিগুলির নীচে নীচে লেখো। নামকরণ করো — "বিভিন্ন ধরনের উনুন ও তার জ্বালানী"।

অনুশীলনী

১) কোন কোন কাজে সূর্যের আলো ব্যবহার করা হয় ? তিনটি উদাহরণ দাও।

২) কোন কোন কাজে সূর্যের তাপ ব্যবহার করা হয় ? চারটি উদারণ দাও।

৩) সূর্যের তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয় — এই ধারণা প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষা চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৪) বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখো।

৫) পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে ?

৬) পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ?

৭) শক্তির প্রকারভেদ কী কী ?

৮) তড়িৎচুম্বক কীভাবে প্রস্তুত করা যায় তা চিত্রসহ লেখো।

৯) বিদ্যুতের সাহায্যে আলো ও তাপ শক্তি উৎপাদনের একটি পরীক্ষা চিত্রসহ বর্ণনা করো।

১০) দুটি চৌম্বক পদার্থ এবং দুটি অচৌম্বক পদার্থের নাম লেখো।

১১) চুম্বকের ব্যবহার হয় এমন চারটি যন্ত্রের নাম লেখো।

১২) শক্তি কাকে বলে ? শক্তির দুটি এককের নাম লেখো।

১৩) পৃথিবী জুড়ে শক্তির সংকট সৃষ্টির কারণ কী? এর থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে ?

১৪) তিনটি খনিজ শক্তি উৎসের উদাহরণ দাও।

১৫) বামদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলাও —

বাম দিক	ডান দিক
১) বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ শক্তি পাওয়া যায়	১) চুম্বকের দিগ্‌দর্শী ধর্মের ব্যবহার করা হয়েছে
২) বৈদ্যুতিক মোটরে	২) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে
৩) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায়	৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়
৪) জাহাজের কম্পাসে	৪) বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়
৫) টারবাইন যুক্ত ডায়নামো ঘুরিয়ে	৫) বৈদ্যুতিক হিটারে
	৬) অযোধ্যা পাহাড়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে

১৬) নীচের শব্দছকটা ভর্তি করো।

১		২		৩		৪	
	৫		৬				
৭							
৮						৯	
		১০					
							১১
		১২					

পাশাপাশি

১) সূর্যের ------------- কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে সবুজ উদ্ভিদ।

৫) এটি একধরনের চৌম্বক পদার্থ।

৮) কেরোসিন জ্বালানীর বাতি।

৯) এই স্বচ্ছ পদার্থটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।

১০) বিদ্যুৎশক্তি থেকে যান্ত্রিকশক্তি পাওয়া যায় এই যন্ত্রে।

১২) এর সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

ওপর-নীচ

১) শক্তির এক বিশেষ একক।

২) এই যন্ত্রে চুম্বকের দিগ্‌দর্শী ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩) ডায়নামো ঘুরিয়ে পাওয়া যায় এই শক্তিকে।

৪) সূর্যের তাপে রান্না করা যায় এতে।

৫) কেরোসিন বা পেট্রোল চালিত এই যন্ত্র জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৬) পশ্চিমবঙ্গের অযোধ্যা পাহাড়ে এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

৭) কাজ করার সামর্থকে বলা হয় ---------------।

১৭) নীচের ঘটনাগুলির কারণ লেখো —

ক) টর্চলাইটের সুইচ টিপলে আলো জ্বলে।

খ) একটি ইস্পাতের কাঁচির গায়ে অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে তারের মধ্যে দিয়ে ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ চালনা করা হল। এর পর দেখা গেল কাঁচিটি ছোট ছোট লোহার আলপিনকে আকর্ষণ করছে।

গ) রান্না করার পাত্র সাধারণত ধাতু দ্বারা তৈরী হয়।

ঘ) পৃথিবীর সব দেশেই সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

পরিমাপ

পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বিষয় বা ঘটনা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারি। যেমন-বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়। কিন্তু দোকানদার চোখের আন্দাজে জিনিসপত্র বেচে না কিংবা দর্জিও চোখের আন্দাজে কাপড় কেটে তোমাদের জামা কাপড় বানায় না। আবার কাঠের মিস্ত্রী আন্দাজে কাঠ কেটে দরজা জানালা কিংবা আসবাব পত্র বানায় না। তেমনি তোমাদের স্কুল যে কোন সময় শুরু হয় না আবার যখন তখন ছুটিও হয়ে যায় না। তোমরাও স্কুলে আসার জন্য নির্দিষ্ট সময় বের হও।

ভরের পরিমাপ
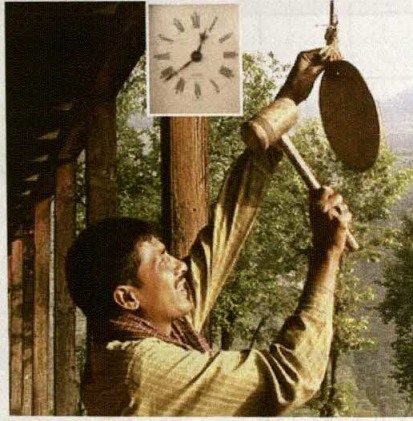
সময়ের পরিমাপ

উদাহরণ - ১

তোমাকে দুটি অসমান দন্ড দেওয়া হল। তুমি চোখে দেখে কোনটা ছোট কোনটা বড় বলতে পারবে। কিন্তু কোনটা কত ছোট বা কোনটা কত বড়, তা বলতে পারবে কি ?
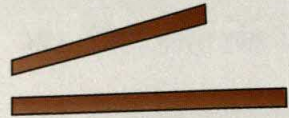
উদাহরণ - ২

পাশাপাশি দুটি পাত্রে অসম পরিমাণ চাল রাখা আছে। তুমি চোখে দেখে কোনটাতে বেশী চাল এবং কোনটাতে কম চাল আছে তা বলতে পারবে। কিন্তু কোনটাতে কত কম বা কোনটাতে কত বেশী তা তুমি চোখে দেখে বলতে পারবে কি ?
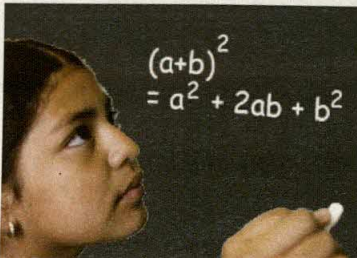
উদাহরণ - ৩

তোমাকে একটা অঙ্ক করতে দেওয়া হল। ঐ অঙ্ক করতে তোমার কত সময় লাগলো, তা কি তুমি সঠিক ভাবে বলতে পারবে ? এসবের জন্য নিখুঁত ও নির্ভুল পরিমাপের প্রয়োজন।

আমাদের কাজ ১

কোন কোন কাজে কী প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা লিখে নীচের সারণী সম্পূর্ণ করো ঃ-

ক্রমিক নং	পরিমাপের বিষয়	পরিমাপক যন্ত্র
১.	নির্দিষ্ট মাপের সরলরেখা টানার জন্য	
২.	দোকানদারের চাল,ডাল,আলু প্রভৃতি পরিমাপের জন্য	
৩.	কতক্ষণ ধরে পড়াশুনা করলে তা হিসাব রাখার জন্য	
৪.	ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মাপার জন্য	
৫.	কাঠের গুঁড়ির দৈর্ঘ্য মাপার জন্য	
৬	দৌড় প্রতিযোগিতায় কতটা দৌড়বে তা ঠিক করার জন্য	
৭.	দৌড় প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট দূরত্ব কত সময়ে দৌড়বে তা পরিমাপের জন্য	
৮.	তরলের আয়তন মাপার জন্য	

জেনে রাখো ঃ

পরিমাপ করা যায় এমন যে কোন প্রাকৃতিক বিষয় বা ঘটনাই ভৌতরাশি।

যেমন —
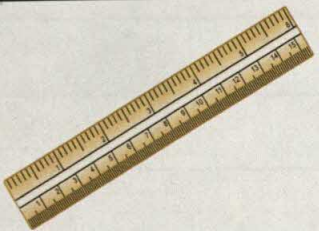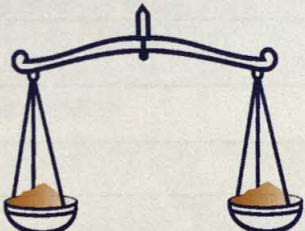
দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তড়িৎ প্রবাহমাত্রা, তাপমাত্রা, দীপন প্রাবল্য, পদার্থের পরিমাণ, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ঘনত্ব, সরণ, বেগ, ত্বরণ, মন্দন, দ্রুতি, কার্য ইত্যাদি।

ভৌতরাশি দুইপ্রকার —

- স্কেলার রাশি
- ভেক্টর রাশি

আমাদের কাজ ২

কোন কোন কাজে কী প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা লিখে নীচের সারণী সম্পূর্ণ করো ঃ

ক্রমিক নং	চিত্র	যন্ত্রের নাম	পরিমাপের বিষয়
১			
২			
৩			
৪			

দৈর্ঘ্য, ভর, আয়তন ও সময় পরিমাপক যন্ত্র

দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য সাধারণ স্কেল, ভর পরিমাপের জন্য সাধারণ তুলাযন্ত্র, আয়তন পরিমাপের জন্য মাপনী চোঙ ও সময় পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘড়ি ব্যবহার করা হয়।

এককের ধারণা ঃ

যদি বলা হয়, - স্কুল থেকে এসে ১ খেলাধূলা করে বাজার থেকে ৫ চাল, ২ আলু, ৫০০ ডাল, ২ ফিতে, ৩ লাল সুতো এনে ৩ পড়াশুনা করবে।

তাহলে উপরের বাক্য থেকে সঠিক কিছু ধারণা পাওয়া গেল কি ?

কিন্তু যদি বলা হয়,

স্কুল থেকে এসে ১ ঘন্টা খেলাধূলা করে বাজার থেকে ৫ কিলোগ্রাম চাল, ২ কিলোগ্রাম আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, ১ লিটার তেল, ২ মিটার ফিতে, ৩ ফুট লাল সুতো এনে ৩ ঘন্টা পড়াশুনা করবে।

তাহলেই উপরের বাক্য থেকে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। এখানে ঘন্টা, কিলোগ্রাম, গ্রাম, ফুট, মিটার, লিটার হল বিভিন্ন পরিমাপের একক।

আমাদের কাজ ৩

তোমরা যে শ্রেণিকক্ষে আছো, সেই শ্রেণিকক্ষের যতগুলি দরজা এবং জানালা আছে সেগুলির দৈর্ঘ্য (লম্বা), প্রস্থ (চওড়া) এবং যে টেবিলটি আছে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ পরিমাপ করে সারণীতে লিপিবদ্ধ করো (একক ব্যবহার করবে)।

পরিমাপের বস্তু	ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য (লম্বা)	প্রস্থ (চওড়া)
দরজা	১		
	২		
জানালা	১		
	২		
	৩		
টেবিল	১		

একক —

একক হল কোন ভৌতরাশির একটি সুবিধাজনক প্রমাণ মান যার সাহায্যে পরিমেয় রাশিটি (পরিমাপ করা হবে যে রাশিটি) ঐ প্রমাণ মানের কতগুণ বা কত অংশ তা নির্ণয় করা হয়।

রাশির পরিমাণ = রাশিটির সাংখ্যমান **X** রাশিটির একক

এককের বিভিন্ন পরিমাপের পদ্ধতি —

ভৌতরাশিকে প্রকাশ করবার তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

- সেন্টিমিটার - গ্রাম - সেকেন্ড পদ্ধতি বা c g s পদ্ধতি।
- ফুট - পাউন্ড - সেকেন্ড পদ্ধতি বা f p s পদ্ধতি।
- মিটার - কিলোগ্রাম - সেকেন্ড পদ্ধতি বা m k s পদ্ধতি।

- **c g s পদ্ধতি —**

  এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এই তিনটি মৌলিক রাশির একক যথাক্রমে সেন্টিমিটার (Centimetre) গ্রাম (Gram) ও সেকেন্ড (Second) তিনটি এককের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর যথাক্রমে c, g, s নিয়ে এই একক পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে c.g.s. পদ্ধতি।

- **f p s পদ্ধতি —**

  এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এই তিনটি মৌলিক রাশির একক যথাক্রমে ফুট (Foot) পাউন্ড (Pound) ও সেকেন্ড (Second) তিনটি এককের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর যথাক্রমে f, p, s নিয়ে এই একক পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে f.p.s. পদ্ধতি।

- **m k s পদ্ধতি —**

  এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এই তিনটি মৌলিক রাশির একক যথাক্রমে মিটার (Metre) কিলোগ্রাম (Kilogram) ও সেকেন্ড (Second) তিনটি এককের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর যথাক্রমে m, k, s নিয়ে এই একক পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে m.k.s. পদ্ধতি।

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি — (S. I. পদ্ধতি)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই একক ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করবার জন্য ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে S. I. একক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় এই তিনটি মৌলিক রাশি ছাড়াও তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা, উষ্ণতা, দীপন প্রাবল্য ও পদার্থের পরিমাণ এই চারটি অর্থাৎ সর্বমোট সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি বলে ধরা হয়।

S. I. পদ্ধতিতে ছটি মৌলিক রাশির এককগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ —

ভৌতরাশি	একক	প্রতীক
দৈর্ঘ্য	মিটার (Metre)	m
ভর	কিলোগ্রাম (Kilogram)	kg
সময়	সেকেন্ড (Second)	S
তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা	অ্যাম্পিয়ার (Ampere)	A
উষ্ণতা	কেলভিন (Kelvin)	K
দীপন প্রাবল্য	ক্যান্ডেলা (Candela)	Cd

একক লেখার কিছু নিয়ম —

- এককের প্রতীকগুলি ছোটহাতের ইংরাজী হরফে লিখতে হবে।

  যেমন — মিটার (metre)-m, কিলোগ্রাম (kilogram)-kg

- কোন বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে একক তৈরী হলে সংক্ষেপে লেখার ক্ষেত্রে নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজীর বড় হরফে লিখলেই হবে, কিন্তু পূর্ণ আকারে লিখলে পুরোটা ছোট হরফে লিখতে হবে।

  যেমন — উষ্ণতার একক — কেলভিন (kelvin) - K

  বলের একক — নিউটন (newton) - N

ব্যতিক্রম ঃ আয়তনের একক লিটার । বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে না হলেও এককটির প্রতীক "L" বড় হরফে লেখা হয়।

- একককে সর্বদা একবচনে লিখতে হয়।

  যেমন — 5 kgs না লিখে 5 kg লিখতে হয়।

  10 cms না লিখে 10 cm লিখতে হয়।

- এককের প্রতীকগুলির পর ফুলস্টপ দিতে হবে না।

  যেমন — 2 cm. নয় 2 cm লিখতে হয়।

  5 kg. নয় 5 kg লিখতে হয়।

- একাধিক বর্ণের সংযোগে যখন শেষ প্রতীক লেখা হয়, তখন প্রতীকে বর্ণ দুটির মাঝে কোন ফাঁক রাখা হয় না।

  যেমন — কিলোমিটার (Kilometre) কে km লেখা হয়, k m নয়।

  সেন্টিমিটার (Centimeter) কে cm লেখা হয়, c m নয়।

- এককের প্রতীককে সর্বদা সোজা করে লিখতে হবে, বাঁকানো হরফে নয়। কেন না, ভৌতরাশির প্রতীক বাঁকা হরফে লেখা হয়।

  যেমন — মিটারের (metre) প্রতীক — 'm'

  ভরের (mass) প্রতীক — '*m*'

আমাদের কাজ ৪

নীচের বাক্যগুলি থেকে কোনটি রাশি, কোনটি সাংখ্যমান এবং কোনটি একক তা আলাদা করে ছকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।

১) খেলার মাঠটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার।

২) বাবা বাজার থেকে ৫ কিলোগ্রাম চাল কিনে এনেছে।

৩) পাত্রে যে তরলটি আছে তার আয়তন ২৫০ ঘন সেন্টিমিটার।

৪) বাড়ী থেকে আমার স্কুলের দূরত্ব ১ কিলোমিটার।

৫) আমি সকালে ৩ ঘন্টা সময় ধরে পড়েছি।

৬) আমাদের শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল ২৯০ বর্গফুট।

ক্রমিক নং	রাশি	সাংখ্যমান	একক
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			

সাধারণ স্কেল ঃ

দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য আমরা সাধারণ স্কেল ব্যবহার করে থাকি। আবার বেশী দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে ফিতে ব্যবহার করা হয়।

স্কেল সাধারণত পাতলা কাঠ, প্লাস্টিক, বা কোন ধাতুর পাতলা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়। স্কেলের একদিকে সেন্টিমিটার এবং অন্যদিকে ইঞ্চিতে দাগ কাটা থাকে।
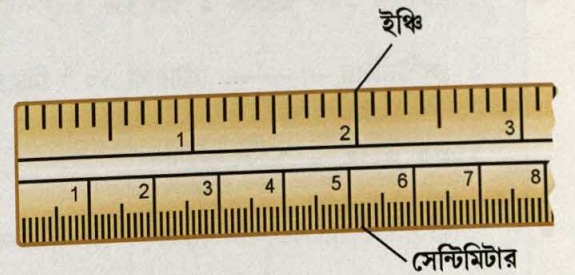
সতর্কতা ঃ

পাঠ নেওয়ার সময় চোখ স্কেলে পাঠ নির্দেশক দাগের লম্বভাবে রেখে পাঠ নিতে হয়। না হলে চোখের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য পাঠ বিভিন্ন হবে। এই ধরনের ক্রটিকে দৃষ্টিক্রমজনিত ক্রটি (Parallax Error) বলে।
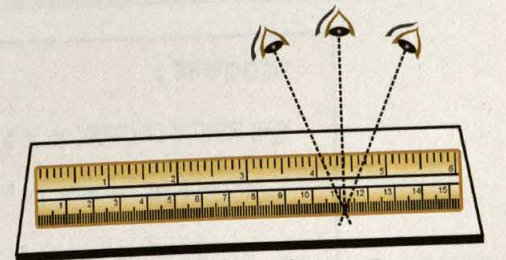
সাধারণ স্কেলের সঠিক ব্যবহার

দৈর্ঘ্য ঃ দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দূরত্বই দৈর্ঘ্য

দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক ঃ

দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য সাধারণত, সেন্টিমিটার, মিটার, ফুট প্রভৃতি একক ব্যবহার করা হয়। আবার খুব বেশী দূরত্বের ক্ষেত্রে কিলোমিটার, মাইল, আলোকবর্ষ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —

পদ্ধতি	একক	প্রতীক
c g s	সেন্টিমিটার (centimetre)	cm
f p s	ফুট (foot)	ft
m k s	মিটার (metre)	m
S. I.	মিটার (metre)	m

প্রমাণ মিটার —

ফ্রান্সের প্যারিস শহরের কাছে Sevre নামক স্থানে আন্তর্জাতিক পরিমাণ সংস্থার (International Bureau of Weights and Measures) দপ্তরে $0^{0}C$ উষ্ণতায় রাখা প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম (৯০ : ১০) সংকর ধাতুর একটি দন্ডের উপর দুটি নির্দিষ্ট সোনার দাগের মাঝের দুরত্বকে এক মিটার বলে ধরা হয়।

- ১ মিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগ হল ১ সেন্টিমিটার

  ১ সেন্টিমিটার = $\frac{১}{১০০}$ মিটার বা $১০^{-২}$ মিটার

  ১০০০ মিটার = ১ কিলোমিটার

- দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবথেকে বড় একক হল পারসেক (Pc)
- ১ পারসেক হল = ৩.২৬ আলোকবর্ষ প্রায়

আলোকবর্ষ ঃ

শূন্য মাধ্যমে সেকেন্ডে ৩×১০^{৮} মিটার বেগে আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই।

১ আলোকবর্ষ = $৩ \times ১০^{৮} \times ৩৬৫ \times ২৪ \times ৬০ \times ৬০$ km

১ আলোকবর্ষ = ৯.৪৬×১০^{১২} km (প্রায়)

আমাদের কাজ ৫

তোমরা তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা স্কেল দিয়ে মেপে লিপিবদ্ধ করো (একই রকম একক ব্যবহার করবে)।

ক্রমিক নং	পরিমাপের বিষয়	পরিমাপ
১	দৈর্ঘ্য	
২	প্রস্থ	
৩	উচ্চতা	

আমাদের কাজ ৬

তোমরা তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের একটা পাতার বেধ নির্ণয় করো (কভার পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে বেধ ৪ বার নির্ণয় করবে এবং একক ব্যবহার করবে)।

ক্রমিক নং	বইয়ের উচ্চতা	গড় উচ্চতা	পৃষ্ঠার সংখ্যা	একটি পাতার বেধ = $\frac{\text{গড় উচ্চতা}}{\text{পৃষ্ঠার সংখ্যা}}$
১				
২				
৩				
৪				

আমাদের কাজ ৭

তোমরা তোমাদের অঙ্ক বইয়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ পরিমাপ করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো (৩ বার করে পরিমাপ করবে এবং একক ব্যবহার করবে)।

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য	গড় দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	গড় প্রস্থ	ক্ষেত্রফল (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ)
১					
২					
৩					

ক্ষেত্রফল ঃ কোন বস্তুর পৃষ্ঠই তল। ঐ তলের পরিমাণই ক্ষেত্রফল।

ক্ষেত্রফলের একক ঃ

CGS পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক বর্গসেন্টিমিটার (cm^2)
পড়তে হবে Square centimetre, Centimetre square নয়।

SI পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক বর্গমিটার (m^2)
পড়তে হবে Square metre, Metre square নয়।

১ বর্গমিটার = $১০^{৪}$ বর্গসেন্টিমিটার

আমাদের কাজ ৮

তোমরা দলগতভাবে সাধারণ তুলাযন্ত্র (দাঁড়িপাল্লা) দিয়ে ৫ টি বিভিন্ন ভরের বস্তুর (শিক্ষক / শিক্ষিকা দেবেন) ভর পরিমাপ করে লিপিবদ্ধ করো (একক লিখবে)।

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	ভরের পরিমান
১		
২		
৩		
৪		
৫		

সাধারণ তুলা ঃ

সাধারণ তুলাযন্ত্র পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ তুলার সরলতম রূপ হলো দাঁড়িপাল্লা। এর একদিকে প্রমাণ বাটখারা রাখা হয় এবং অপরদিকে বস্তু রাখা হয়।

পরিমাপযোগ্য বস্তুর ভর = বাটখারার ভর
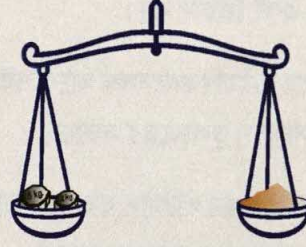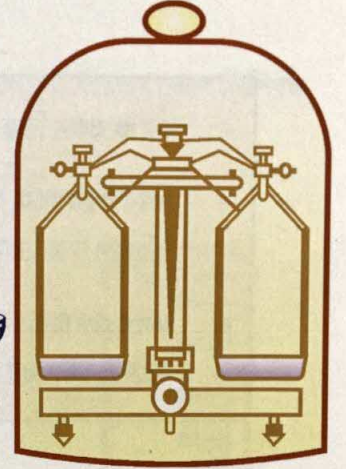
ভর পরিমাপের একক ঃ

- **ভর পরিমাপের জন্য গ্রাম, পাউন্ড, কিলোগ্রাম ইত্যাদি একক ব্যবহৃত হয়।**

বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভরের একক —

পদ্ধতি	একক	প্রতীক
c g s	গ্রাম (Gram)	g
f p s	পাউন্ড (Pound)	lb
m k s	কিলোগ্রাম (Kilogram)	kg
S. I.	কিলোগ্রাম (Kilogram)	kg

- **কিলোগ্রাম —**

  ফ্রান্সের প্যারিস শহরের কাছে (Sevre) সেভর নামক স্থানে আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থার (International Bureau of Weights and Measures) দপ্তরে রাখা প্লাটিনাম ও ইরিডিয়ামের সংকর ধাতুর তৈরী একটি নীরেট চোঙের ভরকে ১ কিলোগ্রাম হিসাবে ধরা হয়।

- গ্রাম —

  ১ কিলোগ্রামের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ হল ১ গ্রাম।

  ১ গ্রাম = $\frac{১}{১০০০}$ কিলোগ্রাম

স্প্রীং তুলাযন্ত্র

- ভর ও ওজন কিন্তু একই জিনিস নয়।
- কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ জড়পদার্থ থাকে তাই ঐ বস্তুর ভর। ভর পরিমাপ করা হয় সাধারণ তুলাযন্ত্রের সাহায্যে।
- ওজন এক প্রকার বল। ওজন পরিমাপ করা হয় স্প্রিং তুলাযন্ত্রের সাহায্যে। কাজেই বস্তুর ভর ও ওজনের এককও আলাদা।
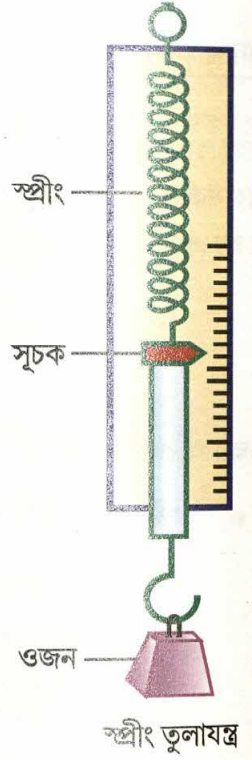
আমাদের কাজ ৯

তোমরা দলগতভাবে মাপনী চোঙের সাহায্যে ৪ টি বিভিন্ন প্রকার তরলের (শিক্ষক/শিক্ষিকা দেবেন) আয়তন মেপে লিপিবদ্ধ করো (একক লিখবে)।

ক্রমিক নং	তরলের নাম	তরলের বর্ণ	আয়তন
১			
২			
৩			
৪			

আমাদের কাজ ১০

দলগতভাবে মাপনী চোঙের সাহায্যে এক ফোঁটা জলের আয়তন নির্ণয় করো। তরলের (শিক্ষক/শিক্ষিকা দেবেন) আয়তন মেপে লিপিবদ্ধ করো। একক লিখবে।

দলের নাম ঃ—

তারিখ ঃ—

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ—

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ—

পর্যবেক্ষণ ঃ—
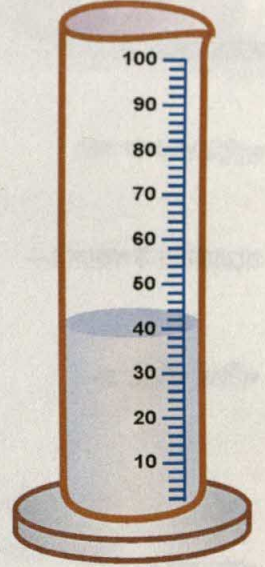
ফলাফল ঃ—

ক্রমিক নং	ফোঁটার সংখ্যা	আয়তন	আয়তন	মোট ফোঁটার সংখ্যা	একটি ফোঁটার আয়তন
১					
২					
৩					
৪					
৫					

আমাদের কাজ ১১

দলগতভাবে মাপনী চোঙের সাহায্যে চোঙে প্রবেশ করতে পারে (জলে অদ্রাব্য) এমন ৫ টি পাথর খন্ডের আয়তন নির্ণয় করো।

দলের নাম ঃ—

তারিখ ঃ—

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ—

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ—
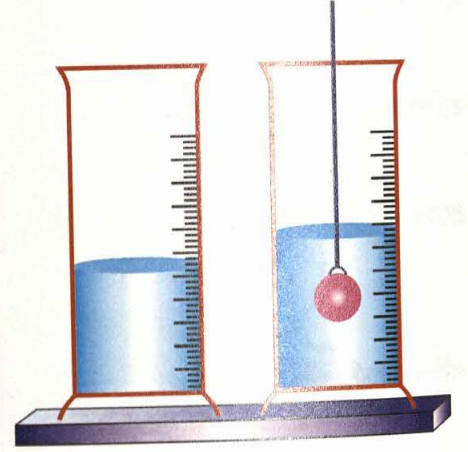
কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়

পর্যবেক্ষণ ঃ—

ফলাফল —

ক্রমিক নং	পাথর ফেলার আগে জলের আয়তন	পাথর ফেলার পরে জলের আয়তন	পাথরের আয়তন
১			
২			
৩			
৪			
৫			

মাপনী চোঙ ঃ

তরল বা কঠিন বস্তুর আয়তন মাপনী চোঙের সাহায্যে খুব সহজে নির্ণয় করা যায়। এটি একটি কাচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি সমান ব্যাস বিশিষ্ট চোঙাকৃতি পাত্র। চোঙের গায়ে ঘন সেন্টিমিটার বা ঘন মিলিমিটারে দাগ কাটা থাকে।
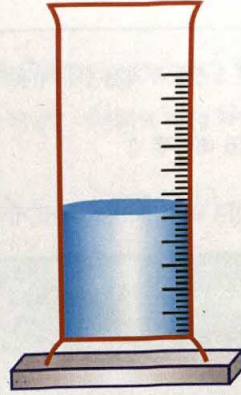
মাপনী চোঙ

তেল মাপার চোঙ
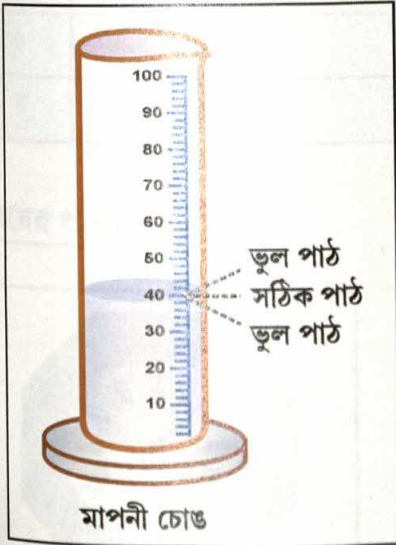
মাপনী চোঙ

মাপনী চোঙটি স্থির অবস্থায় খাড়াভাবে রেখে তরলের তলটি (উত্তল কিংবা অবতল) যে দাগে মিশেছে চিত্র অনুযায়ী তার পাঠ নিতে হবে। না হলে লম্বন ভুল থেকে যাবে।
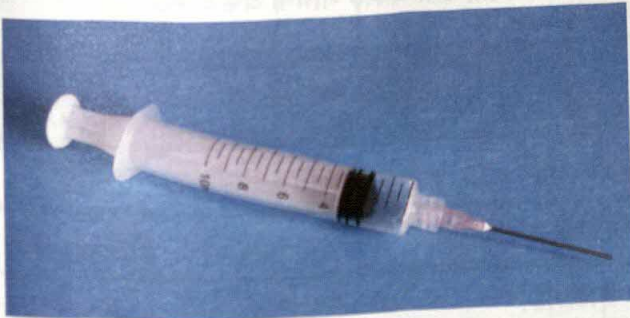
ইনজেকশনের সিরিঞ্জ

ওষুধ মাপার কাপ

আয়তন ঃ কোন বস্তু যে পরিমাণ স্থান দখল করে থাকে তাই ঐ বস্তুর আয়তন।

আয়তন পরিমাপের একক ঃ

তরল আয়তন মাপার জন্য লিটার, ঘনসেন্টিমিটার, মিলিলিটার প্রভৃতি একক ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঃ

CGS পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘনসেন্টিমিটার (cm^3)

পড়তে হবে Cubic centimetre, Centimetre cube নয়।

SI পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘনমিটার (m^3)

পড়তে হবে Cubic metre, Metre cube নয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক লিটার।

৪^{o}C উষ্ণতায় ১ কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে ১ লিটার বলে।

১ লিটার = ১০০০ ঘন সেন্টিমিটার = ০.০০১ বর্গমিটার

১ মিলিলিটার = ০.০০১ লিটার = ১ ঘন সেন্টিমিটার (cm^3)

আমাদের কাজ ১২

তুমি ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত কত সময় ধরে কী কী কাজ করো তার একটি সারণী প্রস্তুত করো —

ক্রমিক নং	কাজের নাম	কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময়
১		
২		
৩		
৪		
৫		

আমাদের কাজ ১৩

দলগতভাবে (৫ জন করে দল করবে, একজন হাঁটবে, অন্য চারজন সময় পরিমাপ করবে) স্কুলের মাঠ কিংবা স্কুলের বারান্দায় একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব সাধারণভাবে হেঁটে যেতে কার কত সময় লাগে পরিমাপ করে লিপিবদ্ধ করো —

দলের নাম — তাং —

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	প্রয়োজনীয় সময়
১		
২		
৩		
৪		
৫		

সময়ের পরিমাপ ঃ

দেওয়াল ঘড়ি

হাত ঘড়ি

ডিজিটাল ঘড়ি

স্টপ ওয়াচ

সময় পরিমাপের জন্য আমরা হাতঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ব্যবহার করি। বৈজ্ঞানিক কাজে বা দৌড় প্রতিযোগিতায় স্টপওয়াচ বা ইলেকট্রনিক্স ডিজিট্যাল ঘড়িও ব্যবহার করা হয়।

সময়ের একক ঃ

সময় পরিমাপের জন্য ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ডকে একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

- cgs, fps, mks, SI পদ্ধতিতে সময়ের একক সেকেন্ড।

- **সৌরদিন —**

  পৃথিবীর কোন স্থানের ভৌগোলিক মধ্যরেখা পরপর দু-বার সূর্যের সামনে আসতে প্রয়োজনীয় সময়ই হল এক সৌরদিন।

- **গড় সৌরদিন —**

  একবছরের অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের সৌরদিনগুলি যোগ করে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করলে যে গড় মান পাওয়া যায়, সেই মানই গড় সৌরদিনের মান।

- ১ গড় সৌরদিনের ৮৬৪০০ ভাগের এক ভাগ হল ১ সেকেন্ড।

- ১ দিন = ২৪ ঘন্টা = ৮৬৪০০ সেকেন্ড।

- ৬০ সেকেন্ড = ১ মিনিট, ৬০ মিনিট = ১ ঘন্টা।

জেনে রাখো ঃ

১. ০০ ঘন্টা = মধ্যরাত ১২ টা

২. ১২ ঘন্টা = দুপুর ১২ টা

৩. ০০ ঘন্টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ধরা হয় a.m.

৪. ১২ ঘন্টা থেকে ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ রাত ১২ টা পর্যন্ত ধরা হয় p.m.

জেনে রাখো ঃ

আমাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে একই রাশির বা বিভিন্ন রাশির ছোট বা বড়ো মান পরিমাপ করার দরকার হয়। রাশিটির মান যদি ছোট হয় তাহলে ছোট একক এবং যদি রাশিটির মান বড় হয় তাহলে বড় একক ব্যবহার না করলে রাশিটির সাংখ্যমান প্রকাশ করতে অসুবিধা হয়।

ধরো বাড়ী থেকে তোমার বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার, যদি সেন্টিমিটারে বলি তাহলে লিখতে হবে ৩০০০০০ সেন্টিমিটার, যা লেখা অসুবিধাজনক।

নিজে করে দেখো ঃ

১) নিচের রাশিগুলির মধ্যে কোনটি ভৌতরাশি এবং কোনটি ভৌতরাশি নয় সেগুলি চিহ্নিত করে পৃথক ঘরে লেখো।

দৈর্ঘ্য, টেবিল, দরজা, জানালা, ভর, সময়, জল, আয়তন, ক্ষেত্রফল, বই, বায়ু, উষ্ণতা, ইট, উচ্চতা, প্রস্থ, বোর্ড।

ভৌতরাশি	ভৌতরাশি নয়

২) নিচের রাশিগুলির cgs এবং SI পদ্ধতিতে এককগুলি ছকের মধ্যে লেখো।

দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, আয়তন, ক্ষেত্রফল।

ক্রমিক নং	ভৌতরাশি	cgs একক	SI একক

৩) তোমাকে একটি কাপে দুধ খেতে দেওয়া হল। এই কাপে কী পরিমাণ দুধ আছে তা কীভাবে পরিমাপ করবে ?

৪) সাধারণ স্কেলের সাহায্যে একটি বক্ররেখার দৈর্ঘ্য কীভাবে পরিমাপ করবে ?

৫) একটি কল থেকে একই হারে জল পড়ছে। কী হারে জল পড়ছে তুমি কীভাবে নির্ণয় করবে ?

৬) সাধারণ তুলাযন্ত্রের (দাঁড়িপাল্লা) সাহায্যে ১০০ গ্রাম লোহা এবং ১০০ গ্রাম তুলো আলাদা আলাদা পরিমাপ করো। তারপর তুলাযন্ত্রের এক পাশে লোহা এবং এক পাশে তুলা রেখে দেখতো সমান হয় কী না ?

আমরা যা শিখলাম

- দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে স্কেল বা ফিতে ব্যবহার করা হয়।
- স্কেলের সাহায্যে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সময় চোখকে স্কেলের পাঠ নির্দেশক দাগের লম্বভাবে রেখে পাঠ নিতে হবে, না হলে চোখের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য পাঠ বিভিন্ন হবে।
- বস্তুর ভর পরিমাপ করার জন্য সাধারণ তুলাযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আবার ওজন পরিমাপ করার জন্য স্প্রীংতুলা ব্যবহার করা হয়।
- সময় পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘড়ি ব্যবহার করা হয়।
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করার জন্য মাপনী চোঙ ব্যবহার করা হয়। অসম আকৃতির কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপের জন্যও মাপনী চোঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার, প্রভৃতি একক ব্যবহার করা হয়।
- ভর পরিমাপের জন্য মিলিগ্রাম, গ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি একক ব্যবহার করা হয়।
- সময় পরিমাপের জন্য সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা প্রভৃতি একক ব্যবহার করা হয়।
- আয়তন পরিমাপের জন্য ঘন সেন্টিমিটার, ঘনমিটার, লিটার, মিলিলিটার প্রভৃতি একক ব্যবহৃত হয়।
- CGS এবং SI পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক —

রাশি	CGS একক	SI একক
দৈর্ঘ্য	সেন্টিমিটার (Cm)	মিটার (m)
ভর	গ্রাম (g)	কিলোগ্রাম (Kg)
সময়	সেকেন্ড (s)	সেকেন্ড (s)

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো ঃ—

ক) কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ জড় পদার্থ থাকে তা হল ঐ বস্তুর -------------------।

খ) ----------------- হল দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব।

গ) দুটো ঘটনার মধ্যে অবকাশ হল -----------------।

ঘ) কোন বস্তু যে পরিমাণ জায়গা দখল করে থাকে তা হল -----------------।

ঙ) ----------------- হল তলের পরিমাপ।

চ) ভৌতরাশির পরিমাপ = সাংখ্যমান X -----------------।

২) উপযুক্ত শব্দ থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো —

ক) CGS পদ্ধতিতে দৈর্ঘের একক —
(i) মিটার (ii) সেন্টিমিটার (iii) মিলিমিটার

খ) SI পদ্ধতিতে ভরের একক —
(i) গ্রাম (ii) মিলিগ্রাম (iii) কিলোগ্রাম

গ) CGS সময়ের একক —
(i) সেকেন্ড (ii) ঘন্টা (iii) মিনিট

ঘ) ভর পরিমাপক যন্ত্রের নাম —
(i) স্কেল (ii) স্প্রীং তুলাযন্ত্র (iii) সাধারণ তুলাযন্ত্র

ঙ) দৈর্ঘ্য মাপা হয় —
(i) তুলাযন্ত্র (ii) স্কেল (iii) মাপনী চোঙ দিয়ে।

৩) নীচের প্রশ্নগুলোর দু এক কথায় উত্তর লেখো —

ক) ভৌতরাশি বলতে কী বোঝ ? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

খ) একক কী ?

গ) দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, পরিমাপক যন্ত্রগুলির নাম লেখো।

ঘ) CGS এবং SI পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক লেখো।

ঙ) CGS এবং SI পদ্ধতিতে ভরের একক লেখো।

৪) কোনটি একই প্রকারের নয় এবং কেন ?

ক) বর্গ সেন্টিমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার, কিলোমিটার।

খ) ঘন্টা, মিনিট, আলোকবর্ষ, সেকেন্ড।

গ) গ্লাস, মিলিমিটার, মিলিগ্রাম, কিলোগ্রাম।

ঘ) বর্গমিটার, বর্গসেন্টিমিটার, মিটার, বর্গফুট।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

জন্ম ঃ ৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮ মৃত্যু ঃ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭

গাছের কি ব্যথা লাগে ? গাছের পাতা নড়লে যে শব্দ হয় তা কি গাছের কথা বলা ? লজ্জাবতীর পাতা ছুঁলে মুড়ে যায় কেন ? গাছ কীভাবে বড় হয় ? প্রশ্নগুলো বালক জগদীশচন্দ্রের মনে ঘুরপাক খায়। উত্তর পান না কারো কাছ থেকে। তাই নিজেই একদিন এর কারণ খুঁজতে শুরু করে দিলেন। তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। আবিষ্কার করলেন অদ্ভুত একটি যন্ত্র - যা দিয়ে গাছের বেড়ে ওঠা মাপা যায়। এই যন্ত্র দিয়েই প্রমাণ করলেন গাছ উত্তেজনায় সাড়া দেয়। সাড়া পড়ে গেল গোটা বিশ্বে। যন্ত্রটির নাম দিলেন ''ক্রেসকোগ্রাফ"।

জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। তাঁর ছোট বেলাটা কেটেছে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ওখানকার ডেপুটি কালেক্টর। বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই তাঁর পড়াশোনা শুরু। বাবা চাইতেন জগদীশ চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। সেই কারণে ন'বছর বয়সে প্রথমে কলকাতার হেয়ার স্কুলে, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ.এ পাশ করেন। বি.এ পাশ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮০ সালে নানান আর্থিক কষ্টের মধ্যেই ইংলন্ডে যান। ইচ্ছা ছিল ডাক্তারী শেখার। কিন্তু বাদ সাধলো শরীর। অসুস্থতার জন্য ডাক্তারী শেখা হল না। পরের বছর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ট্রাইপস পড়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি. পাশ করেন। এর পর কলকাতায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।
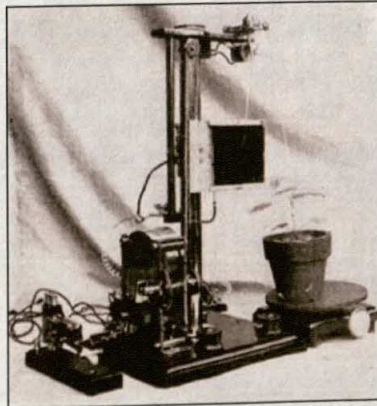
ক্রেসকোগ্রাফ

অধ্যাপনার সাথে সাথে চলে নানান গবেষণা। এই সময় তিনি বেতন বৈষম্য নিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বেতন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে। কিন্তু অধ্যাপনায় কোনো খামতি নেই। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনে। অবাক হয়ে দেখে কত ছোটোখাটো জিনিসের সাহায্যে গবেষণা করা যায়। আবিষ্কার হল ''অদৃশ্য আলোক''। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে পরীক্ষা করে দেখালেন কী করে এই অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে অনেক দূরের যন্ত্রকে চালিত করা যায়। তিনি ৭৫ ফুট দূরে তিনটি ঘরের পর রাখা একটি পিস্তলকে চালিয়েছেন। এই অদৃশ্য আলোক আসলে অণু-তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গ। তিনিই হলেন এর আবিষ্কর্তা। এখানেই থেমে থাকলেন না — তৈরি করলেন বেতার তরঙ্গ গ্রাহক। এর থেকেই রেডিও আবিষ্কার সহজ হল। অতি সাধারণ গবেষণাগারে তাঁকে কাজ করতে হতো। পরাধীন দেশ। কিন্তু কোনো কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। ছাত্রদের বলতেন, ''কোটি টাকায় তৈরি ল্যাবরেটরিতেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় না — প্রকৃত অনুশীলন দ্বারাই যথার্থ আবিষ্কার সম্ভব। অনেক অসুবিধা আছে, অনেক বাধা আছে সত্য কিন্তু সেজন্য তোমরা কখনো নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বে না।'' শুধু কথার কথা নয়, নিজের জীবন দিয়েই তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন। লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ এবং বেশ কিছু গ্রন্থ। একদিকে জড় পদার্থের অজানা রহস্য উন্মোচন, অন্যদিকে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানান স্বভাব ও আচরণের কার্য কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর প্রথম পুস্তক ''জীব ও জড় পদার্থের সাড়া'' (Response in the living and Non living) প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। দ্বিতীয় পুস্তক ''শারীরবৃত্ত গবেষণায় উদ্ভিদের সাড়া'' (১৯০৬), তৃতীয় পুস্তক ''তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত (১৯০৭) — এইভাবে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সাতটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও তিনি একাধিক বই লেখেন। তাঁর লেখা 'অব্যক্ত' 'জীব ও জড়ের মাঝখানে' আজও অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।

তিনি সারাজীবনে নানান সম্মান পেয়েছেন যেমন ''নাইট'' উপাধি, রয়াল সোসাইটির সদস্যপদ ইত্যাদি কিন্তু সব থেকে বড় সম্মান কোটি কোটি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 'আচার্য'। তাঁর তৈরি বসু বিজ্ঞান মন্দির আজও এই দেশের প্রথম সারির একটি গবেষণা কেন্দ্র। তোমরাও যদি চেষ্টা কর একদিন জগদীশচন্দ্র হতে পারবে। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু, ভগিনী নিবেদিতার স্নেহভাজন এই মানুষটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

আর্যভট

১৯৭৫ সালের ১৯ শে এপ্রিল ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাড়ি দেয়। উপগ্রহটির নাম রাখা হয়'.'আর্যভট্ট"। যে বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল তাঁর নাম ছিল আর্যভট। আমরা ভুল করে আর্যভট্ট বলি। কে ছিলেন এই আর্যভট ?

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক যদি হন কোপারনিকাস, প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক হলেন আর্যভট। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর পর ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের সেই সময়কার রাজধানী পাটলীপুত্রের কাছে কুসুমপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পাটলীপুত্রই হল এখনকার পাটনা, বিহার রাজ্যের রাজধানী। এখন প্রশ্ন হল জ্যোতির্বিজ্ঞান কী ? বিজ্ঞানের যে শাখা মহাকাশ এবং মহাকাশে অবস্থিত গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান, ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে তাকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে। পৃথিবী একটি গ্রহ। এরকম নটি গ্রহ সূর্য নামক নক্ষত্রকে ঘিরে ঘুরছে তা কিন্তু প্রথম আর্যভট-ই বলেছিলেন। শুধু তাই নয় পৃথিবী তার নিজের কক্ষের চারদিকে ২৪ ঘন্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে তাও তিনি প্রথম বলেন। এছাড়াও ৩০ দিনে এক মাস,১২মাসে এক বছর, ৪৩,২০,০০০ সৌর বৎসরে এক মহাযুগ এসবই আর্যভটের আবিষ্কার। তার রচিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যসিদ্ধান্ত' এবং 'অর্ধরাত্রিকা'। এর মধ্যে আর্যসিদ্ধান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি তখন ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে দূরদুর দেশে বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হত। শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, তাঁকে সর্বকালের সেরা গণিতবিদও বলা হয়। জ্যামিতির বিভিন্ন নিয়ম বা সিদ্ধান্ত, পাই (π)-এর মান, বর্গমূল, ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি ইত্যাদি গণিতের বহু জটিল সমস্যার সমাধান তিনি বের করেছিলেন। এই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানুষটিকে ঘিরে সেই সময় পাটলীপুত্র নগরে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও জ্যোতির্বিদ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ শাসন ইত্যাদি রাজনৈতিক কারণে আর্যভট তাঁর যোগ্য সম্মান পান নি। এখন তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের কাছে নির্ভুল প্রমাণ হওয়ায় তাকে আমরা যোগ্য সম্মান দিতে পারছি। মনে রেখো খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে একই নামে আরেকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথা জানা যায়। তিনিও 'আর্যসিদ্ধান্ত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম আর্যভট-ই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

বিঃ দ্রঃ - ভারতকোষ, সমরেন্দ্রনাথ সেন রচিত "বিজ্ঞানের ইতিহাস" এবং অরূপরতন ভট্টাচার্য রচিত "প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান" গ্রন্থগুলি অনুসারে আর্যভট্ট-এর পরিবর্তে আর্যভট ব্যবহার করা হল।

সুশ্রুত

মানুষ আসে, মানুষ যায়। তার মধ্যে কিছু কিছু মানুষের অবদান আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই তাঁদের জীবনী আমাদের পড়তে হয়। জীবনে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে একটা সমস্যা হল অসুস্থতা। কোন কোন রোগ ওষুধেই সেরে যায়, আবার কোন কোন রোগের জন্য অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়। একে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষায় শল্যচিকিৎসা বলে। বর্তমান যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় আজ থেকে বহু বছর আগে এই শল্যচিকিৎসার জনক কে ছিলেন? হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই ধরেছ । এখানে 'সুশ্রুত'-এর কথা বলা হচ্ছে। সুশ্রুতের সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্প্রসারিত হয়।

তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। আবার পন্ডিতদের মতে এই বিশ্বামিত্র বৈদিক যুগে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র নন। তথ্য থেকে জানা যায় সুশ্রুত কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। কবিরাজ ধন্বন্তরির কাছে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকের 'চরক সংহিতার' পর সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতার' স্থান, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গবেষকের মতে সুশ্রুত লিখিত গ্রন্থটি হল 'সুশ্রুত তন্ত্র'।

তিনি সমগ্র জীবকূলকে দুভাগে ভাগ করে ছিলেন — স্থবির (উদ্ভিদ) ও জঙ্গম (প্রাণী)। তাঁর বই থেকে আবার উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিভিন্ন ভাগের সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। সাপের দুটি ভাগের (বিষহীন, বিষধর) পরিচয় আমরা তাঁর লেখা থেকে পাই।

তাঁর বই থেকে প্রায় ৩০০ রোগের অস্ত্রোপচার এবং ১২০ ধরনের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রোগগুলোর মধ্যে ভগন্দর, টনসিল, চোখের ছানি, হার্নিয়া প্রভৃতির বিবরণ আছে। অস্ত্রোপচারের পর গরম বিশুদ্ধ জল দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা কিংবা কাপড়ের গজ ঢোকানো, পট্টি বাঁধা প্রভৃতির বিবরণ সুশ্রুতের লেখা থেকে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় উদ্ভিদের আঁশ ও পশুলোম দিয়ে অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান সেলাই করার বিবরণও পাওয়া যায়। আধুনিক শল্যচিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্লাস্টিক সার্জারি এবং রিনোপ্লাস্টি (Rhinoplasty) বা নতুন নাসিকা প্রস্তুত বিদ্যা সুশ্রুতের অবদান।

তাই শল্যচিকিৎসা বিদ্যার জনক হিসাবে চিকিৎসাজগতে তিনি অমর হয়ে আছেন।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
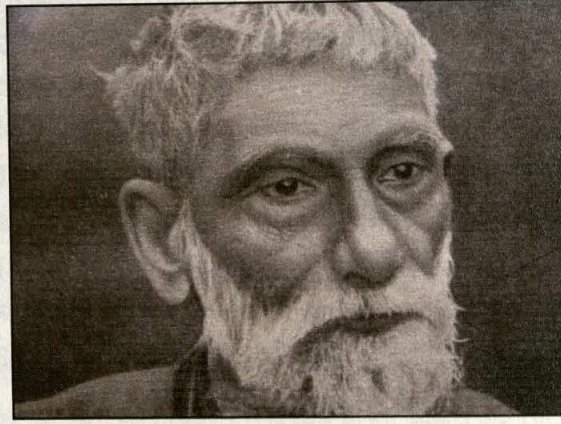
জন্ম ঃ ২রা আগষ্ট, ১৮৬১ **মৃত্যু ঃ ১৬ই জুন, ১৯৪৪**

এক মুখ খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, এলোমেলো চুল, অত্যন্ত সাধারণ অবিন্যস্ত পোশাক কিন্তু দুটি গভীর টানাটানা দরদী চোখের মানুষটির ছবি তোমরা হয়তো অনেকে দেখে থাকবে। ইনি হলেন বাংলার গৌরব, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই আত্মভোলা মানুষটিকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্মস্ট্রং বলতেন 'মাস্টার অফ নাইট্রাইটস্', ইংরেজ সরকার দিয়েছিলেন 'নাইট' খেতাব।

১৮৬১ সালে যশোর জেলার এক মোটামুটি সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। পড়াশোনায় একদম মন ছিল না। বাবা হরিশচন্দ্র চাইতেন প্রফুল্ল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হোক্। নয় বছর বয়সে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলেই বছর তিনেক আগে জগদীশচন্দ্র বসু ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রও অসুস্থতার কারণে এই স্কুলে বেশি দিন পড়তে পারেন নি। জগদীশচন্দ্র থেকে মাত্র তিন বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু পরে এই দুই মহান মানুষের মধ্যে অদ্ভুত মিল ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দেখা যায়।

কলকাতায় আসার পর লেখাপড়ায় আশ্চর্যজনক আগ্রহ তৈরি হয় প্রফুল্লচন্দ্রের মনে। অসুস্থ শরীর নিয়েই নানান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। দুবছর লেখাপড়া বন্ধ রেখে ১৮৭৬ সালে অ্যালবার্ট স্কুলে এবং সেখান থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে ১৮৭৮ সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশান (এখন যার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) -এ ভর্তি হন। এখান থেকে এফ. এ. (First Arts) পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজ বি.এ. তে ভর্তি হন। যদিও তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁর ভাললাগার বিষয় ছিল সাহিত্য, ইতিহাস আর জীববিদ্যা, সংস্কৃত ভাষায় ছিল অসাধারণ দক্ষতা। এই দক্ষতাই তাঁকে পরবর্তিকালে 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' নামের বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয় এই ভাষাজ্ঞানের সাহায্যেই তিনি গীলখ্রীষ্ট পুরস্কার লাভ করেন এবং তার অর্থেই ১৮৮২ সালে ইংল্যন্ডে পড়াশোনা করতে যান। গীলখ্রীষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য অন্ততঃ চারটি ভাষা জানা জরুরী ছিল।

এই মানুষটি ইংলেন্ড থেকে ফিরে এসে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন তখন থেকেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। চাকরী পাওয়ার আগে বেশ কিছুদিন তিনি জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর আশ্রয়েই ছিলেন। এই সময় গাছপালা, পশু-পাখী নানান প্রাণী সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। তাঁর নিজের কথায় রসায়নবিদ্যা শেখা ছিল একটি নিছক দুর্ঘটনা। কেমন ছিলেন এই শিক্ষক? রসায়নবিদ্যায় তার মত শিক্ষক তখন আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। অত্যন্ত সহজ ভাষায় রসায়নের জটিল তত্ত্ব, রঙ্গরস সহযোগে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করতেন। নিজে সংসার করেন নি। বিজ্ঞান কলেজ ছিল তাঁর বাসস্থান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিজ্ঞান কলেজেই কাটিয়েছেন। সঙ্গে থাকতো ন'দশটি দুস্থ ছাত্র- যাদের যাবতীয় খরচ বহন করতেন তিনি। ১৯০৪ সালে তিনি বিজ্ঞান কলেজে প্রথম রসায়নের অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর অনুরোধে। ১৯২১ সালে যখন তাঁর বয়স ৬০, তখন তাঁর যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা সব বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এর তৎকালীন মূল্য ছিল একলক্ষ আশি হাজার টাকা। এছাড়াও রসায়নে গবেষণার জন্য বিখ্যাত ভারতীয় অ্যালকেমিস্ট নাগার্জুনের নামে একটি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার গবেষণার জন্য একটি পুরস্কারের জন্য মোট কুড়ি হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

একটি ভাল গবেষণাগারের জন্য সারাজীবন আক্ষেপ করে গেছেন। তাঁর গবেষণা মূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসাধারণ। মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কর্তা এই অতিসাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষটিকে তাঁর ছাত্ররা বলতেন "ভারতীয় রসায়নবিদ্যার জনক"। তাঁকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল রসায়নবিদ্যার গবেষকদের প্রতিষ্ঠান। তিনি একাধারে ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, অন্যদিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি। বঙ্কিমচন্দ্র, শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। এই বিচিত্র প্রতিভার মানুষটির সবার প্রিয় ছিল নিজের দেশ ও দেশবাসী। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, সারা জীবন চরকা কেটেছেন, যেখানেই বন্যা, খরা বা মহামারী দেখা দিয়েছে সেখানেই আর্তের সেবার জন্য ছাত্রদের নিয়ে ছুটে গিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই পেটের রোগে ভুগতেন। তাঁর ঐ শীর্ণ চেহারা তাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারতো না। ছাত্রদের নিজের সন্তানের থেকেও বেশি ভালবাসতেন। তাঁর আদরের বহিঃপ্রকাশ ছিল গোটাকয়েক কিল আর ঘুসি।

প্রফুল্লচন্দ্র চাইতেন ভারতবর্ষ শিল্পে নিজের পায়ে দাঁড়াক। নিজের সর্বস্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন " বেঙ্গল কেমিক্যালস এবং ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কস" যা আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি রচনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ যার মধ্যে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "একজন বাঙালী রসায়নবিদের জীবন ও অভিজ্ঞতা" এবং " হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" উল্লেখযোগ্য।

৮৩ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালে এই চির বিজ্ঞানতপস্বীর মৃত্যু ঘটে বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাঙ্গণে, তখনও তার পাশে ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্ররা।

অনুশীলনী

১) **শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো —**

ক) ----------------------- যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমাণ করলেন, গাছ উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

খ) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ------------------------।

গ) সর্বকালের অন্যতম সেরা গণিতবিদ ------------------------।

ঘ) সুশ্রুত লিখিত গ্রন্থটি হল ------------------------।

ঙ) ১৯০৪ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান কলেজে ---------------------- বিষয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

২) **দু-এক কথায় উত্তর দাও —**

ক) সমগ্র জীবকুলকে দুভাগে ভাগ করার কথা সুশ্রুত-এর লেখা বই থেকে পাওয়া যায় — এই দুটি ভাগ কী কী ?

খ) জগদীশ চন্দ্র বসু রচিত পুস্তকগুলি কী কী ?

গ) অস্ত্রোপচারের পর কাটা স্থানে সেলাই করার কথা সুশ্রুত এর লেখা বই থেকে পাওয়া যায় — এই কাটাস্থান কী দিয়ে সেলাই করা হত ?

ঘ) প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির নাম কী ?

ঙ) আর্যভটের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নাম লেখো।

৩) ক)
- আমি ৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করি।
- আমি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলাম।
- আমি তৈরী করেছিলাম বেতার তরঙ্গ গ্রাহক।
- আমার তৈরী বসু বিজ্ঞান মন্দির আজও এই দেশের প্রথম সারির গবেষণা কেন্দ্র।

— আমি কে ?

খ)
- আমি ১৯৬১ সালে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করি।
- ২০১১ সালের ২রা আগস্ট আমার জন্মের সার্ধশত বর্ষ পূর্ণ হল।
- রাসায়নিক যৌগ নিয়ে গবেষণা করে আমি বিশ্ববরেণ্য হই।

— আমি কে ?

৪) সঠিক উত্তরটি বেছে নাও —

কলকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যালস এবং ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন —

ক) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

খ) সুশ্রুত

গ) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ঘ) আর্যভট

৫) স্তম্ভ মেলাও —

আর্যভট	শল্য চিকিৎসার জনক
আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু	সর্বকালের সেরা গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	প্রমাণ করেন উদ্ভিদেরাও প্রাণীদের মত উদ্দীপনায় সাড়া দেয়
সুশ্রুত	মারকিউরাস নাইট্রাইট নামে স্থায়ী রাসায়নিক যৌগ প্রস্তুত করেন